আর 'তপতী' গদ্যে রচিত। 'তপতী'র রাণী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় তাঁহার মানবীয়তা হারাইয়া প্রায় দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। উভয় নাটকের পার্থক্যের পরিচয় কবি নিজেই তপতীর ভূমিকায় যাহা দিয়াছেন, তাহা আগে উদ্ধৃত হইয়াছে।

Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Dep...
Jagannath University Dhaka

বিসর্জন

বিসর্জন একখানি নাট্য-কাব্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নাটকগুলির মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কবির সৃজনীশক্তি, হৃদয়ের উদারতা ও সত্যনিষ্ঠা আকার ধারণ করিয়াছে। বিসর্জন নাটকের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহার প্রথম সংস্করণটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বিসর্জন নাটকের বিশ্লেষণ ও আলোচনা আমি প্রধানত ঐ সংস্করণ অনুযায়ীই করিয়াছি।

বিসর্জন নাটকের গল্পাংশ কবির স্বরচিত রাজর্ষি উপন্যাস হইতে লওয়া। এই রাজর্ষি লেখার ইতিহাস কবি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন—

......দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে যাই। কলিকাতা ফিরিবার সময় রাত্রে গাড়িতে ভিড় ছিল; ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না,—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না, তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল! স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তাহার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

—জীবনস্মৃতি

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের মধ্যে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, মহারাণী গুণবতী ও যুবরাজ নক্ষত্ররায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ছত্রমাণিক্য-নামে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার ও গোবিন্দমাণিক্যের স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ ঐতিহাসিক ঘটনা।......

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম আঠারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্প বিসর্জনে ব্যবহার করা হইয়াছে। ৩২, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ পরিচ্ছেদ হইতে নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহের কথাও লওয়া হইয়াছে। রাজর্ষির অন্যান্য অংশের সহিত বিসর্জনের কোনো সম্পর্ক নাই।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্ররায়, রঘুপতি, জয়সিংহ, হাসি ও তাতা—এই কয়জনের কথা রাজর্ষি-উপন্যাসে আছে। গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল বিসর্জনের মধ্যে কবির নূতন সৃষ্টি। রাজর্ষি-উপন্যাসে হাসি ও তাতার কাকা কেদারেশ্বরের কথা আছে; বিসর্জনের প্রথম সংস্করণেও কেদারেশ্বরের কথা ছিল, পরে বাদ যায়।……বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে অপর্ণার অন্ধ পিতার কথা ছিল, পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হইয়াছে।……

বিসর্জনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা ১২৯৭ সালে—ইংরেজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩০৩ সালের সংগৃহীত সংস্করণে ইহার অনেকখানি বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য—বর্তমান সংস্করণে ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য—নূতন যোগ করা হয়।…শেষ দৃশ্যের শেষ অংশটি পরে লেখা, সম্ভবতঃ ১৩১০ সালে……।—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; বিসর্জন নাটকের পরিচয় (১৩৩৩ সালের বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। নাটকখানি সম্বন্ধে টম্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন—

"Sacrifice is the greatest drama in Bengali literature...All these dramas are vehicles of thought rather than expressions of action; and they show the poet's mind powerfully working on the subject of such things in popular Hinduism as its bloody ritual of sacrifice. The dramas show also how the poet was emancipating himself from the tangles of the solely artistic aim of life. Sacrifice shows how greatly we slander Eternal Truth, when—

The wrong that pains our souls below
We dare to throne above.

—Whittier.

Like Malini it teaches that love and not orthodoxy worships God, and it burns like a slow deep fire against bigotry. In all the plays, it is the woman who brings truth near, and often the woman who is a mere child.

Sacrifice and Malini and Karna-Kunti-Sambad undoubtedly placed him securely for all time into the small class of very great dramatists."

রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে চাহিলে প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপর্ণা এতটুকু মেয়ে, কিন্তু তাহার শক্তি অপরিমেয়—সে জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া যাইতে ডাকিতেছে, রঘুপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, রাজাকে সত্যদৃষ্টি দিয়া

সত্যপথে তাঁহাকে অটল দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। রঘুপতির ভয় গোবিন্দ-মাণিক্যকে নহে, রাজার সৈন্য-সামন্তকেও নহে, তাঁহার ভয় ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে। যতক্ষণ প্রথা মিথ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীকে, ভাই ভাইকে, প্রজা রাজাকে, পিতা (রঘুপতি) পুত্রকে (জয়সিংহকে) পর্যন্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু ছোট্ট একটু প্রাণের প্রীতি ও করুণার স্পর্শে রাজার যেই সত্যদর্শন ঘটিল, অমনি মিথ্যা প্রথা ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সকলে সত্যের অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল।—প্রেম ও মনুষ্যত্ব সকলকে সমস্ত মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে অব্যাহতি দিল। একটি জীবন্ত প্রাণশক্তি জড়ত্বের উপরে জয়ী হইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে। যেমন ছোট একটি বটের চারা প্রকাণ্ড পাথরের মন্দিরের শুষ্কতাকে এবং একটু ঘাসের নাতা মরুভূমির বিরাট বন্ধ্যাত্বকে জয় করিতে উদ্যত হয়, তেমনি সামান্য বালিকা অপর্ণার করুণা যুগ-যুগান্তরের জড় প্রথাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

মানুষের চিরন্তন মনোবৃত্তি প্রেম মায়া মমতা দরদ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কতকগুলা বিধি-নিষেধ ও আচারের শুষ্ক শাসন মাত্র মানিয়া চলিলে জয়সিংহের মত মহাপ্রাণকে বিসর্জন দিতে হয়। জয়সিংহের অপঘাত মৃত্যুতে রঘুপতির দারুণ মর্মদাহ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছে। বিসর্জন নাটকে আছে—মানব-প্রণীত আচার-বিধির নৃশংসতার বিরুদ্ধে মানব-চিত্তের বেদনার্ত প্রতিবাদ। তাই অন্ধসংস্কারে জড়িত জয়সিংহ রঘুপতির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াও 'রাজরক্ত চাই' বাক্য দেবীর বাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মানুষ সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকিলে পদে পদে ভুল করে—হৃদয়ের ও মনুষ্যত্বের চিরন্তন সত্যকে দেখিতে পায় না। বিধি আচার যত পুরাতনই হোক তাহার স্থান মনুষ্যত্বের ও হৃদয়-ধর্মের অনেক নীচে।

প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ বর্ণিত হইয়াছে বিসর্জনে, আর যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ দেখানো হইয়াছে কবির পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী'তে।

রঘুপতি ত্রিপুরা-রাজ্যের চিরাগত 'বৃদ্ধ প্রথা'—ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে চিরাগত বলিদানের প্রথা বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই প্রথা বজায় রাখিবার জন্য রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে ও প্রজাদিগকে বিদ্রোহী ও উত্তেজিত করিতে, এবং রাজা ও রাণীর মধ্যেও বিরোধ ঘটাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু রঘুপতির উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের লোভ বা স্বার্থপরতার

ক্ষুদ্রতার লেশ মাত্র নাই, এইজন্য তিনি পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেন। এই যে বিরোধ—ইহা কেবল মতের বিরোধ, ইহার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র উদ্দেশ্য নাই। যদিও রঘুপতি রাজাকে গুপ্তহত্যা করাইতে বা প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, তিনি যে প্রথাকে সত্য ও ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছিলেন তাহারই সমর্থনের জন্য তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য রঘুপতি রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার চরিত্রসৃষ্টি।

কিন্তু বিসর্জনের জয়সিংহ কবির একটি উৎকৃষ্টতর ও সুন্দরতর চরিত্রসৃষ্টি। গুরুর প্রতি এবং গুরুর বাক্যের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু তাঁহার মনের উপর বিবেকের প্রভাব গুরুভক্তির চেয়েও প্রবলতর; রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠে তাঁহার বিবেকই তাঁহাকে বলিল—

অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। —২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

এবং তিনি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গুরুকে বলিলেন—

ছি ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী! —তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

জয়সিংহের মনের মধ্যে এই গুরুভক্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে আত্ম-বিসর্জন করিয়া—নিজের রক্ত দিয়া—রাজ্যের বিদ্বেষানল নির্বাপিত করিতে প্রেরণা দিল। জয়সিংহের এই আত্মবিসর্জন অতীব অপূর্ব ও গৌরবমণ্ডিত।

ইংরেজ কবি শেলী যেমন Spirit of Universal Love দ্বারা জগতের সকল অমঙ্গল ও পাপ দূর করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি প্রেমের দ্বারা সকল অকল্যাণ মোচন করিতে চাহিয়াছেন। সেই ভাবের প্রতীক হইতেছে অপর্ণা; অপর্ণা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষ যখন প্রথা ও শাস্ত্রের কাছে আপনার বুদ্ধি ও বিবেককে বলি দিয়া পাপের ও নৃশংসতার লীলায় সমাজকে ছারখার করিতে উদ্যত হয়, তখনই প্রেমাবতার অপর্ণার আবির্ভাব আবশ্যক হয় —যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অনেকের মনে প্রেমের বীজ গুপ্ত সুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অঙ্কুরিত ও প্রকাশিত হইতে অপরের প্রেমের বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার কথায় নিজের অন্তরের সেই সুপ্ত প্রেমের প্রথম পরিচয় পাইলেন। জয়সিংহ গুরুভক্তির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, তাই তিনি সাহস করিয়া প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে

পারিতেছিলেন না; অপর্ণা-রূপিণী প্রেম-বৃত্তি জয়প্রসিনী—আজ হোক কাল হোক প্রেমের কাছে সকলকেই পরাজয় ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। রঘুপতি পুরাতন প্রথার পাষাণ-ভিত্তি তাঁহার

কঠিন ললাট
পাষাণ-সোপান যেন দেবী-মন্দিরের। —২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

প্রেমের বীজ সেই পাষাণের মধ্যেও পড়িয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটিতেছিল। যখন তাঁহার প্রাণপ্রতিম পালিত-পুত্র জয়সিংহ আপন রক্ত দিয়া প্রথার পাষাণ-ভিত্তি সিক্ত শিথিল-মূল এবং সরস করিয়া দিল, তখন সেই পাষাণের অন্তরেও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ ও অনুকূল অবস্থা লাভ করিল। রঘুপতি তখন বুঝিতে পারিলেন যে জীবন্ত প্রেম-প্রতিমা অপর্ণার তুলনায় পাষাণী কালী-প্রতিমা কত তুচ্ছ—

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী! —৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য

এখন রঘুপতি অপর্ণাকেই মা বলিয়া অবলম্বন করিলেন। অপর্ণা সমস্ত নাটকের মধ্যে বিস্ময়জনক কিছুই করে নাই, তবু কবির কলাকৌশলে সে-ই সমস্ত ঘটনার মূল ও কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই—নাটকের প্রারম্ভে আমরা দেখি অপর্ণা বেগে প্রবেশ করিয়াই পূজায় আসীন রাজার নিকটে নিবেদন করিল—"বিচার প্রার্থনা করি।" এইখানে কবি সুকৌশলে সমস্ত নাটকের মূল বস্তুটিকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা দেব-মন্দিরে পূজায় আসীন; ইহাতে প্রথমেই রাজাকে ধার্মিক-রূপে দেখানো হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন অপর্ণার ছাগশিশু কে কাড়িয়া লইয়াছে? অপর্ণা উত্তর দিল—

রাজ-ভৃত্য তব।
রাজ-মন্দিরের পূজা। বলির লাগিয়া
নিয়ে গেছে।

এই অভিযোগ রাজার কাছে রাজারই বিরুদ্ধে। অপর্ণার সরলতা তাহাকে নির্ভীক তেজস্বিনী করিয়াছিল।

এমন সময়ে জয়সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই বালিকার মনে বেদনা দিয়া তাহার ছাগশিশু কাড়িয়া আনা হইয়াছে,—

এ দান কি নেবেন মা'গো
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে

জয়সিংহ দেবতার প্রতি একান্ত বিশ্বাসশালী, আবার অপর দিকে দয়ার্দ্র-হৃদয় উদার-স্বভাব। তিনি বালিকার বেদনা ও মহারাজের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন—

মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।

ইহাকে নাটকীয় গূঢ় ইঙ্গিত বলা যাইতে পারে (Dramatic Irony)। জয়সিংহের এই কথার মধ্যে নাটকের আগামী ঘটনার আভাসই দেওয়া হইয়াছে।

অপর্ণা ও জয়সিংহ প্রস্থান করিলেন। রাজা হাসি ও তাহার ভাই তাতার জন্য পূজার আসনে বসিয়াই উৎসুক হইতেছিলেন। ইহার দ্বারা কবি একটি নাটকীয় ইঙ্গিত পাঠকদিগকে পূর্বাহ্ণে জানাইয়া রাখিলেন যে, হাসি ও তাতা সম্বন্ধে রাজার দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

হাসি ও তাতা আসিল। তাহারা রাজার সহিত যাইতে যাইতে দেবীর মন্দির-সোপানে রক্তের দাগ দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত রক্ত কেন?

ইহার একটু আগেই অপর্ণা আসিয়া তাহার ছাগশিশু-হরণের অভিযোগ করিয়া রাজার চিত্ত করুণায় দ্রব করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার হাসির প্রশ্নে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনের কন্দরে কন্দরে হাসির সেই প্রশ্নই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—এত রক্ত কেন?

জয়সিংহ ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন যে অপর্ণার ছাগ আর পাওয়া যাইবে না, 'মা তাহারে নিয়েছেন।' এই কথা শুনিয়া অপর্ণা তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—

মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা। রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

অপর্ণা-রূপে আবির্ভূতা মূর্তিমতী করুণা সত্যধর্মের হিংসাহীনতা প্রচার করিল; সে স্পষ্ট বাক্যে বলিয়া দিল যে মাতার ধর্ম মমতা, করুণা; আর রাক্ষসীর ধর্ম হিংসা; অতএব যে রক্তলোলুপ, সে রাক্ষসী নয় তো কি!

জয়সিংহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথচ সরল বিশ্বাসী, তাই তিনি অপর্ণার মুখে ঐ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ছি ছি!
ও-কথা এনো না মুখে।

রাজা এই দুই জনের দুই ভাবের মধ্যে দ্বিধান্বিত হইয়া কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তিনি বলিলেন—

বৎসে, আমি বাক্যহীন।

রাজার ও অপর্ণার কথা শুনিয়া জয়সিংহও দ্বিধান্বিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে সংস্কার ও বুদ্ধির, সংস্কার ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল—

করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর!

জয়সিংহের ব্যথিত চিত্তের পরিচয় পাইয়া অপর্ণার মনে তাঁহার প্রতি প্রণয়-সঞ্চার হইতেছে। আজন্ম-স্বাধীনা অপর্ণা মেয়ে হইয়াও জয়সিংহকে সেই মন্দিরের নিষ্ঠুর আবেষ্টন ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে অসঙ্কোচে আহ্বান করিল।

জয়সিংহ অপর্ণার এই করুণ প্রীতির আহ্বান শুনিয়া নূতন এক অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাইলেন। তাঁহার অন্ধভক্তি অপর্ণার প্রেমের স্পর্শে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণা-কাতর কণ্ঠে। ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি'।

—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

জয়সিংহ দেবী-প্রতিমাকে গিরিনন্দিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, প্রতিমা পাষাণে নির্মিত এবং তাঁহার হৃদয়কে অপর্ণার প্রেমধারা পাষাণতনয়া নির্ঝর-ধারার ন্যায় অভিষিক্ত করিয়াছে বলিয়া। জয়সিংহ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

জয়সিংহ অপর্ণাকে শোভনা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল অপর্ণা বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ সৌন্দর্যে শোভাময়ী। জয়সিংহের মনে

সত্যধর্ম জানিবার জন্য ব্যগ্র বাসনা জাগ্রত হইয়াছে, তিনি পাষাণ-প্রতিমায় আর চিত্তের আশ্রয় পাইতেছেন না! সেইজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় আশ্রয় আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন গোবিন্দমাণিক্য—যেথা আছে প্রেম! জয়সিংহ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—কোথা আছে প্রেম? জয়সিংহ তো প্রেমের সহিত এখন পর্যন্ত পরিচিত হন নাই, তাই তাঁহার মনে অপরিচয়ের দ্বিধা জাগিতেছে।

জয়সিংহ অপর্ণাকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন।

অপর্ণা ও জয়সিংহ চলিয়া যাইতেই হাসি বলিয়া উঠিল—"এইবার সব মুছে গেছে!" মন্দিরে পাষাণ-প্রতিমার পরিবর্তে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইবামাত্র হিংসার চিহ্ন রক্তের সব দাগ মুছিয়া গেল।

প্রথম অঙ্কের এই প্রথম দৃশ্যটি সমস্ত নাটকীয় ঘটনার উপক্রমণিকা মাত্র। এখানে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ভাবী সংগ্রামের নিমিত্ত বলসঞ্চয় করিল, ইহা যুদ্ধের উদ্‌যোগপর্ব। রঘুপতির নিষ্ঠুর-শক্তি রাণীকে সমগ্রভাবে এবং অপর্ণার দেবী-শক্তি কারুণ্য-শক্তি রাজাকে সমগ্রভাবে এবং উভয়ের বিভিন্নধর্মী শক্তি জয়সিংহকে আংশিকভাবে অধিকার করিয়া বলসঞ্চয়ের দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রঘুপতির প্রভাবে ও প্ররোচনায় রাণী বলি দিতে ও রাজা অপর্ণার প্রভাবে বলি নিষেধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইহার ফলে গৃহবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইল। একদিকে রঘুপতি ও রাণী, অপর দিকে অপর্ণা ও রাজা, এবং ইহাদের উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দ্বিধান্বিত হইয়া রহিলেন জয়সিংহ।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মহারাণী গুণবতী দেবী-মন্দিরে পূজা করিতে করিতে একাকিনী চিন্তা করিতেছেন—'মার কাছে কী করেছি দোষ?' প্রথমেই তিনি দেবীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া নিজের মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তিনি রাজরাণী স্বামী-সোহাগিনী, কিন্তু সন্তানহীনা। নিঃসন্তান অবস্থার ক্ষোভ তাঁহাকে পীড়া দেয়। তিনি বলিতেছেন যে, যে ভিখারিণী পেটের দায়ে পেটের সন্তানকে বিক্রয় করে, অথবা যে পাপিষ্ঠা কুলটা লজ্জার দায়ে সন্তান হত্যা করে, তুমি তাহাদেরও সন্তান দাও, কেবল আমাকেই বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! সতীধর্মত্যাগিনী নারীও সন্তানপ্রসূতী হয় বলিয়া তাহার উপর নিঃসন্তানা সাধ্বী মহারাণীর কোপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে পাপিষ্ঠা বলাতে। ভিখারিণী ও পাপিষ্ঠার সঙ্গে রাণী নিজের অবস্থার

তুলন সমালোচনা করিতেছেন। তিনি চাহেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার কোলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে উপহার দিবে—"অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!" কিন্তু সেই সুখ তাঁহার ভাগ্যে এখনো জুটে নাই। তাই তিনি কুমার-জননী দেবীকে প্রার্থনার ছলে ভর্ৎসনা করিতেছেন—

কুমার-জননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

যিনি নিজে কুমারের জননী, যিনি মাতৃত্বের আনন্দ নিজে আস্বাদন করিয়া জানিয়াছেন, তিনি কেন মহারাণীকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা রাণীর ধারণার অতীত। মহারাণীর একটি মাত্র অভাব; সেই অভাব-পূরণের সুখ তাঁহার কাছে স্বর্গতুল্য প্রতিভাত হইতেছে, তিনি মাতৃস্বর্গের সুখ পাইতে ব্যাকুল।

দেবীর পূজক রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাণীর মনের চিন্তা কথায় পরিব্যক্ত হইয়া গেল, তিনি রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তো চিরদিন মার পূজা করিয়া আসিতেছি, আমার স্বামীও মহাদেব-সম নিষ্পাপ, তবে কোন্ দোষে সেই মহামায়া আমাকে নিঃসন্তান-শ্মশান-চারিণী করিলেন? রাণীর নিকটে নিঃসন্তান অবস্থা শ্মশানের তুল্য মনে হইতেছে। রাণী দেবীকে মহামায়া বলিয়া নির্দেশ করিলেন—তাঁহার লীলা ও উদ্দেশ্য দুর্জ্ঞেয় বলিয়া। রঘুপতি দেবীর পূজক, সুতরাং দেবী-মহিমার মর্মজ্ঞ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব এবং তিনি বিশ্বমাতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও সমর্থ হইতে পারেন; এইজন্য রাণী তাঁহার কাছে নিজের মনের ক্ষোভ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি রাণী, তাঁহার বিহ্বলতা কোন কারণেই শোভা পায় না, সেইহেতু তাঁহার অভিযোগ খুব সংযত ও মহিমান্বিত।

রাণী গুণবতী দেবীকে মহামায়া বলিয়াছিলেন। রঘুপতিও সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—মায়ের মহিমা কে বুঝিতে পারে, তিনি ইচ্ছাময়ী, তিনি পাষাণ-তনয়া, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে দয়া মমতা কিছু নাই, এবং তিনি খেয়ালী।

গুণবতী বলিলেন—

করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন,
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ' মহিষ,
তিন শত ছাগ!

রাণী স্বার্থান্ধ হইয়া দেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি যদি একটি শিশু পান, তাহা হইলে সেই শিশুর প্রাণের বিনিময়ে তিনি প্রতি বৎসর চারিশত পশু-শিশুর প্রাণ বধ করিবেন! এইখানে স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল, রাণীর ও রাজার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের সূত্রপাত হইল। রাণী যে কী অন্যায় অসঙ্গত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন তাহা তিনি নিজের স্বার্থপরতার মোহে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন হাসি ও তাতা আসিতেছে। অমনি তাঁহার মন তাহাদের প্রতি ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল, কারণ রাজা তাহাদের ভালোবাসেন; সেই ভালোবাসা রাণীর গর্ভজ সন্তান পাইবার পূর্বে তাহারা বেদখল করিয়া লইতেছে বলিয়া রাণীর হিংসা। রাণী স্বার্থপর, তিনি নিজে মাতৃত্বের আস্বাদ পাইতে চাহেন, কিন্তু মাতৃহীনকে মাতার স্নেহমমতা দিতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহার মনে পরের ছেলের প্রতি হিংসার উদ্রেক হইতেই তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন—

পরের ছেলেরে হিংসা ক'রে অকল্যাণ
হবে, লাগিবে পুত্রহীনারে মাতৃশাপ।

রাণী নিজের স্বার্থহানির ভয়েই হিংসা সংবরণ করিতে চাহিতেছেন—নিজের স্বাভাবিক নারীপ্রবৃত্তির বশবর্তিনী হইয়া নহে। তিনি হাসি ও তাতাকে আদর করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তখনই দেখিলেন যে রাজা আসিতেছেন, অমনি তাহাদের প্রতি রাজার স্নেহ উদ্রেকের ভয়ে রাণীর চেষ্টাকৃত আদর দূর হইয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রাজাকে তিনি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে রাজা তাঁহার রাজপুত্রের প্রাপ্য অপরকে বিতরণ করিয়া অনুচিত কার্য করিতেছেন। কিন্তু রাজা বলিলেন—

স্নেহ পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যত দান
করো। স্রোতস্বিনী হ'য়ে ওঠে, যত ধরে
নির্ঝরের ধারা।

রাজা রাণীকে বুঝাইতে চাহিলেন যে—স্বার্থপরতা ও স্নেহ বিরুদ্ধার্থী—এক সঙ্কীর্ণ, অপর উদার। কোনো বাক্যকে নানাবিধ উপমা দ্বারা সমর্থন করিয়া তাহার যথার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তোলাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে তিনি সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাণী দেবী-প্রতিমার নিকটে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিলেন—

মহামায়া, কত রক্ত কত প্রাণ চাও,
আমারে করিতে দান সেই প্রাণটুক্!

অপরের প্রাণহানি করিয়া রাণী নিজের কোলে একটু প্রাণকণিকা পাইতে চাহেন। এই অসঙ্গতি তাঁহার স্বার্থান্ধ মন কিছুতেই অনুভব করিতে পারিতেছিল না।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মন্দিরে জয়সিংহ ও অপর্ণা আলাপ করিতেছেন। জয়সিংহ বলিতেছেন—তুমি আমার কাছে আরো কিছুদিন থাকো, "তোমাদের দুঃখ দূর ক'রে ধন্য হই।" জয়সিংহের এই দুঃখ দূর করার প্রস্তাব অপর্ণার ভালো লাগিল না, সে তো দয়া অনেকের দ্বারে পাইয়াছে, সেই দয়া সে জয়সিংহের কাছে চায় না, তাই সে বলিল, "আরো দয়া আবশ্যক কি বা?" জয়সিংহ বলিয়া ফেলিলেন, "জানো তো বালিকা, অতিথি দেবতা সম।" এই বালিকা-সম্বোধন অপর্ণার কানে ও প্রাণে বাজিল, সে বলিয়া উঠিল—

বালিকা! বালিকা ওরে অতিথি-সন্মান!
কাঙাল বালিকা, ভিক্ষা ভালো, ভিক্ষা ভালো!

সে যে যুবতী হইয়াছে, জয়সিংহের সাক্ষাৎ যে তাহার প্রাণে প্রেম জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, এই সংবাদ তো তাহার আর অগোচরে নাই, কিন্তু অন্ধ জয়সিংহ যদি তাহা দেখিয়াও না দেখেন, বুঝিয়াও না বুঝিতে চান, তবে তাঁহার কাছে দয়া পাওয়ার চেয়ে অন্যত্র ভিক্ষা ঢের শ্লাঘ্য। অপর্ণা চায় জয়সিংহের প্রেম, প্রেমের প্রতিদানে প্রেম, সে অনুগ্রহ চাহে না। অপর্ণা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে!

সে এই বিপুলা ও বহুজনসমাকীর্ণা পৃথিবীতে একাকিনী, কেহ তাহাকে এখনো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত তো হইল না।

ইহার পরেই জনতার প্রবেশ। তাহারা রক্তপাতের আনন্দে উন্মত্ত, তাহারা ধর্মের প্রথাকেই জানে, তাহারা হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারে না।

জয়সিংহ অরণ্যে অচেতন হাসিকে কোলে করিয়া সেই মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজাও হাসিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিলেন এবং

রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া আনিতে জয়সিংহকে পাঠাইলেন। হাসি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল—'রক্ত! রক্ত!' তাহা শুনিয়া রাজা করুণ কণ্ঠে বলিলেন—

এখনো কি মোছে নি, মা, করুণ হৃদয়
হ'তে সেই শোণিতের দাগ!

হাসি রক্তের প্রলাপ বকিতে বকিতে মরিয়া গেল। তাহার এই করুণ বিলাপ শুনিয়া রাজা ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

আমি এই রক্ত-স্রোত
বন্ধ ক'রে দিব!

রাজশক্তির দম্ভে রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি রাজা, আমি এই রক্তপাত বন্ধ করিয়া দিব। এমন সময়ে অনুচরেরা রাণীর পূজা লইয়া আসিল। রাজা সেই পূজা ফিরাইয়া দিলেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্য নিজের রাজশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সত্যধর্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, দেবতাকে রাজশক্তির বা অন্য-কোন বাহ্য শক্তির অধীন করিলে পিশাচ-শক্তিকেই জাগ্রত করা হয়। সত্যের তো বাহ্য বল নাই, তাহার সবল আন্তর বল, আত্মিক শক্তি। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—রাজসভা, প্রাতঃকাল। সেখানে সেনাপতি নয়নরায় ও দেওয়ান চাঁদপাল তুচ্ছ বিদ্রূপ করিতে করিতে কলহ করিবার উপক্রম করিতেছেন,—নয়নরায়ের পদ আগে, না চাঁদপালের পদ আগে, ইহা লইয়া উভয়ের তর্ক। চাঁদপাল বলিলেন—

সর্ব-অগ্রে তুমি পাবে স্থান
হেন দেশে করো গিয়ে বাস, চুকে যাবে
গণ্ডগোল, . . .

এই কথার মধ্য দিয়া কবি এখানে আগন্তুক ভবিষ্যৎ ঘটনার একটি ছায়াপাত করিয়াছেন, নয়নরায়কে যে শীঘ্রই রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইতে হইবে এবং সেনাপতির পদ চাঁদপাল পাইবেন, সে ঘটনার সূচনা এইখানে হইয়া রহিল। মন্ত্রী উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া নয়নরায়কে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহার উত্তরে নয়নরায়ও মন্ত্রীকে শ্লেষবাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করিলেন,—

জেনো মন্ত্রী, অতিরিক্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি যার
তারি নিত্য অকারণ অসন্তোষ! বুদ্ধি

তার বিশ্বচরাচর বিঁধিতে ব্যাকুল।
আমার তো সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই! শুধু আছে
ভক্তের হৃদয়—আর সৈন্যের কৃপাণ!

এই কথার মধ্যে নয়নরায়ের চরিত্র স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত—দেবতা ও রাজার উভয়েরই। তিনি বিশ্বাসী সেনা ও বীর।*

রাজা আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ও আসিলেন।† সকলে গাত্রোত্থান করিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিল, জয় ঘোষণা করিল। কিন্তু রঘুপতি দাম্ভিক, তিনি রাজাকে আশীর্বাদ না করিয়াই একেবারে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

রাজার ভাণ্ডারে এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

তিনি রাজার কাছে প্রার্থনা করিতে আসেন নাই, রাজার ভাণ্ডারে যেন তাঁহারই ন্যাস গচ্ছিত আছে, তাহা তিনি নিজের অধিকারে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।

রাজা বলি নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই রাজসভায় আসিয়াছিলেন, রঘুপতির প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ রাজাকে সেই সুযোগ দিল, তিনি বলি-নিষেধের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজার এই নূতন নিয়মে সকলে অবাক্ হইয়া গেল। সেনাপতি নয়নরায় সরল দৃঢ়প্রকৃতি সত্যপ্রিয় নির্ভীক তেজস্বী বিশ্বাসী রাজভক্ত। তিনিই সর্বপ্রথম রাজাজ্ঞার অযৌক্তিকতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'বলি নিষেধ!' মন্ত্রী তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—'নিষেধ!' নক্ষত্ররায় চপলচিত্ত, আত্মনির্ভরতাহীন, পরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র, তিনি বলিলেন,—'তাইতো। বলি নিষেধ!' রঘুপতি রাজাদেশ শুনিয়া এমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন যে তিনি সকলের শেষে কথা কহিলেন। তিনি যেন নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন রাজা ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবার কে? তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'এ কি স্বপ্নে শুনি?' রাজা কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না, তিনি যাহা সত্য ও উচিত বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার বাক্য সংযত দৃঢ় এবং সংক্ষিপ্ত। রাজা বলিলেন,—এই আদেশ স্বপ্ন নহে, দেবী স্বয়ং বালিকার মূর্তি ধরিয়া আসিয়া তাঁহার সত্যদৃষ্টি

---

* পরবর্তী সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ২-য় অঙ্কের ১-ম দৃশ্যের এই প্রথমাংশ বর্জিত হইয়াছে।

† পরবর্তী সংস্করণের ১-ম অঙ্কের ২-য় দৃশ্য আরম্ভ।

উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। রঘুপতি বলিলেন, 'শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।' গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন,—'সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ!' রঘুপতির অহংকারে আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন—আমি দেবীর পূজক, ব্রাহ্মণ, আমি শুনিলাম না দেবীর আদেশ, আর তুমি শুনিতে পাইলে! ইহা কেবল বুদ্ধি নয়, অহংকারও!

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পাষণ্ড, নাস্তিক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধীর অটল স্বরে আদেশ প্রচার করিলেন—

যে করিবে জীব-হত্যা জীব-জননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দণ্ড।

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্বলের শেষ সম্বল অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন—
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও।

চাঁদপাল ছুটিয়া আসিয়া রঘুপতিকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ভণ্ড প্রতারক. সে চাটুকার, সে মনে এক বাহিরে আর; সে ক্রূর, সে বাহিরে দেখাইল যেন সে রাজার মঙ্গলের জন্য সকল সভাসদ্ অপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত।

সত্যভ্রষ্ট রাজা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতকেও ভয় করিলেন না, তিনি স্বীয় বাক্যে রঘুপতিকে বিদায় দিলেন।

রঘুপতি যাইতে যাইতে রাজার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গেলেন—

হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই কার! আমি আছি
আছেন দেবতা।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্র বিষাদে অভিমান্ রাজসী. সেনাপতি নয়নরায় রাজার নিকটে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

কোন্ অধিকারে, প্রভু, জননীর বলি......

রাজা তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। মন্ত্রী রাজাকে তাঁহার আদেশ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা অটল, তিনি বলিলেন—

বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

সকলে বিস্মিত বিহ্বল হইয়া গেলেন, দেবীর নিকটে বলিদান পাপ! মন্ত্রী কথা কহিলেন—

পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধ'রে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতা-চরণ-তলে বৃদ্ধ হ'য়ে এলো,
সে কি পাপ হ'তে পারে?

এই কথায় রাজা চিন্তিত হইয়া নিরুত্তর হইলেন। ইহাই তো সকল কুসংস্কারের প্রধান যুক্তি! যাহা এত কাল টিকিয়া আছে, আমাদের বাপ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখনো মন্দ হইতে পারে?

এমন সময়ে ধ্রুব আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি কোথা?*

রাজা ধ্রুবকে দেখিয়া ও মৃতা হাসিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পণ ধ্রুব করিলেন এবং পুনরায় বলি-বন্ধের আদেশ দিলেন। রাজা ধ্রুবকে লইয়া রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজার অনুপস্থিতিতে সকলে রাজার কার্যের সমালোচনা করিতে লাগিল। কেবল ধূর্ত চাঁদপাল বলিল—

ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

চাঁদপাল ভীরু সত্য, কিন্তু তাহার দুষ্টবুদ্ধি প্রচুর এবং সে প্রকাশ্যে নিজেকে রাজভক্ত বলিয়া প্রচার করিলেও সে বাস্তবিক রাজভক্ত নহে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্দিরে জয়সিংহ একাকী দেবী-প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—দেবীর কাছে থাকিয়াও তাঁহার কেন একাকী বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহাকে কে যেন বাহির হইতে ডাকিতেছে মনে হইতেছে। অমনি তিনি অপর্ণার গান শুনিতে পাইলেন—

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জানো কি একেলা কারে বলে? অপর্ণা উত্তর দিল—

জানি! যবে ব'সে আছি ভরা মনে,
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

---

* পরবর্তী সংস্করণে ধ্রুবের প্রবেশ এখানে নাই।

জয়সিংহ এই উক্তি পূরণ করিয়া দিলেন—

স্বজনের
আগে দেবতা যেমন একা!

অপর্ণা জয়সিংহকে বলিল—

যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।

আর আমিও—

এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

দয়ার দানে মানুষকে খর্ব হীন করে, আর প্রেমের দানে তাহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলে। দয়ার দানে নিজের দৈন্য উৎকট হইয়া উঠে, আর প্রেমের দানে নিজের দৈন্য ঢাকা পড়িয়া যায়। তাই জয়সিংহ বলিলেন—

যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে!
যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।

এমন সময়ে জয়সিংহের গুরুদেব রঘুপতি আসিতেছেন দেখা গেল। তাঁহার ভয়ে অপর্ণা পলায়ন করিল, কারণ রঘুপতির—

কঠিন ললাট
পাষাণ-সোপান যেন দেবী-মন্দিরের!

অপর্ণা পলায়ন করিল। কিন্তু জয়সিংহ অপর্ণার কথারই জের টানিয়া নিজ মনে বলিলেন, 'কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর'।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া রাজসভা হইতে আসিয়াছেন। জয়সিংহের সহিত তিনি কথা কহিলেন না, জয়সিংহের সেবা গ্রহণে আগ্রহ দেখাইলেন না, সকল কথাতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জয়সিংহের প্রতি স্নেহে তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিল এবং তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার মন ক্ষুব্ধ হইয়া আছে বলিয়া তিনি জয়সিংহের প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছেন। জয়সিংহ রঘুপতিকে তাঁহার ক্ষোভের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুপতি উত্তরে বলিলেন,—রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন।

অতঃপর রঘুপতি জয়সিংহকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, যে-হেতু জয়সিংহের কাছে গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জয়সিংহ ইহাতে বলিলেন—

প্রভু, পিতৃকোলে বসি'
মুগ্ধ শিশু আকাশে বাড়ায় দুটি হাত
পূর্ণচন্দ্র পানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!

গোবিন্দমাণিক্যের মহৎ চরিত্র জয়সিংহের নিকটে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি রাজার আদেশ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যতদিন প্রাণ
আছে, অসম্পূর্ণ নাহি র'বে জননীর পূজা।

এখানে আগামী ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছে,—জয়সিংহ যে নিজের প্রাণ দিয়া এই দেবী-প্রতিমার শেষ পূজা করিয়া যাইবেন তাহার আভাস কবি জয়সিংহের কথার ভিতর দিয়া দিয়াছেন।*

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুর। মহারাণী গুণবতীকে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে রাণীর পূজা মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রাণী জানিতে চাহিলেন, কাহার এত বড় স্পর্ধা যে রাণীর পূজা মন্দির হইতে ফিরাইয়া দিতে সাহস করে! পরিচারিকা ভয়ে রাজার নাম বলিতে পারিল না। তখন মহারাণী রঘুপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এমন সময় গোবিন্দমাণিক্য আসিলেন। রাণী কুপিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে সেই দুঃসাহসী যে তাঁহার পূজা ফিরাইয়া দিয়াছে?

রাজা বলিলেন যে, তিনি জানেন কে সেই অপরাধী। তবে তিনি তাহার অপরাধের জন্য রাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।†

---

* পরবর্তী সংস্করণে ইহা ১-ম অঙ্কের ৩-য় দৃশ্য।

† পরবর্তী সংস্করণে ইহা ১-ম অঙ্কের ৪-র্থ দৃশ্য।

রাণী উঠে হইয়া বলিলেন—

দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা। দয়ার দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব।

রাজা নম্রভাবে স্বীকার করিলেন যে সেই অপরাধী তিনি নিজে।

রাণী অপরাধীকে দণ্ড দিবেন বলিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পরে জানিতে পারিলেন যে সেই অপরাধী কে। তখন নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জিদ ও স্বামীর প্রতি অভিমান তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। রাণী রাজার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলিলেন—আমি দেবীর কাছে পূজা দিব মানৎ করিয়া রাখিয়াছি, অতএব আমি যেমন করিয়া পারি যথাবিধানে তাঁহার পূজা দিব। রাজা মনে করিলেন, রাণীর কোপ ও অভিমান কালক্রমে উপশমিত হইয়া যাইবে। তিনি রাণীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে রঘুপতি রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।* রাণী তাঁহাকে দেখিয়াই ক্ষুব্ধ স্বরে অভিযোগ করিলেন—"ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে জননীর দ্বার হতে!"

রঘুপতি রাণীর কথা সংশোধন করিয়া বলিলেন—

মহারাণী, মার পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার।

রঘুপতি রাণীকে ভয় দেখাইবার জন্য অভিসম্পাত দিলেন যে বলি নিষিদ্ধ করার ফলে রাজমহিমা—

হবে যাবে ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

রাণী ব্রহ্মশাপের ভয়ে স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া রঘুপতিকে মিনতি করিয়া বলিলেন—রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু! রাণী অভিমান ও জিদের বশে স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী হইতে চাহিয়াও এখন স্বামীর অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল, কারণ তিনি তো স্বভাবত সাধ্বী ও স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী।

* পরবর্তী সংস্করণে এই দৃশ্য ৩-য় দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রঘুপতি রাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণের শাপের ভয় মিথ্যা, কলির ব্রাহ্মণের কি আর ব্রহ্মতেজ আছে?

ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনারে
আপনি দংশিছে, আহত বৃশ্চিক সম!

তিনি তাঁহার উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের ব্রহ্মণ্যতেজের অক্ষমতা ও নিষ্ফলতাকে ধিক্কার দিতে উদ্যত হইলেন। কবির 'রাজা ও রাণী' নাটকেও রাজার বয়স্য দেবদত্ত নিজের পৈতা সম্বন্ধে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন—

"স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস!"

—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

ব্রাহ্মণকে পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত দেখিয়া রাণী সন্ত্রস্তা হইলেন; স্বামীর অমঙ্গলে তাঁহারও তো অমঙ্গল হইবে! তিনি সেইদিকে রঘুপতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয় স্বামীকে রক্ষা করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে,—আমি তো নির্দোষ, আমাকে আপনি রক্ষা করুন। তখন রঘুপতি বলিলেন—'তবে ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।' তিনি বলিতে চাহিলেন যে, দেবীর মন্দিরে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, সেখানে রাজার কোনো অধিকার নাই,—ব্রাহ্মণের বিধানের উপর রাজার কোনো প্রভুত্ব খাটে না।

রাণী অঙ্গীকার করিলেন—তিনি সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না, দেবী-পূজার ব্যাঘাত ঘটিতে দিবেন না। ইহাতে রঘুপতি সন্তুষ্ট হইয়াও হইতে পারিলেন না, তিনি ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সহিত রাণীকে বলিলেন—

দেবতা কৃতার্থ
হ'ল তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে গেল
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,
এ যুগে, যতদিন নাহি জাগে কল্কি-
অবতার!

রঘুপতি প্রস্থান করিলে রাজা আসিলেন। রাজা রাণীকে ভালোবাসেন, রাণীর অপ্রসন্নতা তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল, তাই তিনি রাণীকে প্রসন্ন করিয়া তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। তাছাড়া, তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে কিছুক্ষণের বিচ্ছেদ ও চিন্তায় রাণীর চিত্ত প্রশান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া

থাকিবে। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ইতিমধ্যে রঘুপতি আসিয়া রাণীর মন তাঁহার প্রতি অধিক বিরূপ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রাণী বিরাগ-ভরে রাজাকে বলিলেন—তুমি এখান হইতে যাও, তোমার পশ্চাতে দেবতার ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফিরিতেছে, এখানে সেই অভিশাপ আনিয়ো না।

রাজা মধুর শান্ত বচনে বলিলেন—

প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অবহেলা
দূর! সতীর হৃদয় হ'তে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।

কিন্তু রাণী কিছুতেই নম্র হইলেন না। তখন রাজা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাণী মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া রাণীর প্রার্থনা পূরণ করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে রাজা অটল, তখন রাণীই পরাজয় স্বীকার করিয়া রাজার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাণীকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সত্যে ও প্রেমে তুল্যভাবে বিশ্বাসপরায়ণ। রাণীকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে—'অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর পূজা।'

রাণী রাজার সহিত যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইয়া মিনতি করিয়া 'ভিক্ষা' চাহিলেন,—'চিরাগত প্রথা' রাজা রক্ষা করুন, প্রেমের খাতিরে রাজা যদি তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটিও করেন, তবু দেবতা তাহা ক্ষমা করিবেন।

রাজা 'চিররক্ত-পানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা' কিছুতেই পালন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাণী অভিমানে বিমুখ হইয়া মুখ ঢাকিয়া রাজাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে রাজা বলিলেন—'কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।' নারীর সাহায্য ও সমর্থন হৃদয়কে শক্তি দান করে, সেই নারী যদি বিমুখ হয়, তবে পুরুষের পক্ষে কর্তব্য পালন করা কঠিন হইয়া উঠে।

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাণী মনে করিলেন যে, তিনি 'পুত্রহীনা' বলিয়া রাজা তাঁহাকে অবহেলা করিয়া যাইতে পারিলেন। তাঁহার একটি পুত্র থাকিলে রাজা এমন করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প

করিলেন তিনি অপমানিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া থাকিবেন না, তিনি হইবেন 'উর্বশী ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।'

পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল—'ব্রাহ্মণ অতিথি যত গেছে চলি' রাজগৃহ ছেড়ে।' রাণী নিষ্ঠুর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

শুনে সুখ
হ'ল।.....
স্নেহ-ভিক্ষা-হীন রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী
কত দিন থাকে দেখা যাবে। দেখা যাবে!

রাজার পরাভবে এখন তাঁহার আনন্দ বোধ হইতেছে, তিনি নিজের জিদের জয় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য—জয়সিংহ স্বগত চিন্তা করিতেছিলেন, অপর্ণা, কাছে ছিল। জয়সিংহ ভাবিতেছিলেন—

তিনটি দেবতা ছিল! এক গেল, শুধু
দুটি আছে বাকি!

জয়সিংহের মনের আরাধ্য আদর্শ ছিলেন তিনজন—দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর পাষাণ-মূর্তি, তাঁহার পালক-পিতা ও গুরু রঘুপতি এবং মহৎ-চরিত্র রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য। এই তিনের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের বিসর্জন হইয়া গেল,—তিনি দেবতা ও ধর্মের শত্রু। কিন্তু সেই বিসর্জনে তো তাঁহার মন প্রসন্ন হইতেছে না। জয়সিংহকে চিন্তিত দেখিয়া অপর্ণা তাঁহার চিন্তার ভাগ লইতে চাহিল। কিন্তু জয়সিংহ নিজের মনের দ্বিধান্বিত অবস্থার বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, তিনি অপর্ণাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে অপর্ণা ব্যথিতা হইল, তাহার অভিমানও হইল, সে চিন্তা করিতে লাগিল—

তবে আমি কেহ নই হেথা! মোর নাই
কোনো কাজ! শুধু আমি ভিখারিণী মেয়ে—
দেবো স্নেহ, দেবো না কিছুই!—বুঝিব না,
কাঁদিব না, ভালবাসিব না! শুধু রবো
নিশ্চিন্তে নীরবে! যেথা যাই শুধু দয়া!
গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ।
তবে ভিক্ষা ভালো, ভিক্ষা ভালো! জয়সিংহ,
আমি তব তরুলতা নহি! আমি নারী!

অপর্ণার অন্তরে নারীত্বের মহিমা ও প্রেম জাগ্রত হইয়াছে, সে জয়সিংহকে

ভালোবাসিয়াছে, সে তাঁহার উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাই তাহার আবার সেই গান মনে পড়িল—'আমি একেলা চলেছি এ ভবে!'*

রাণী তিন শত পাঁঠা ও এক শত এক মহিষ বলি দিয়া দেবীর পূজা দিবেন শুনিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে একদল লোক আসিয়াছিল, তাহারা হতাশ হইয়া ত্রিপুরার লোকেদের টিট্‌কারী দিতে দিতে চলিয়া গেল।†

রঘুপতি সেনাপতি নয়নরায়কে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাকে অনেক প্ররোচনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেনাপতি রাজভক্ত, তিনি বিশ্বাসহন্তা হইতে স্বীকার করিলেন না। রঘুপতি নিজের ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য অপরকে অধর্ম করিতে, রাজভৃত্যকে বিশ্বাসঘাতক হইতে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন অধর্মের দ্বারা ধর্ম রক্ষা করিবেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, যেখানে সত্য শাশ্বত ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে অধর্মই প্রবল হইয়া উঠে। রঘুপতি সেনাপতিকে বিদ্রোহী করিতে না পারিয়া প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রজাদের দ্বারা মন্দির-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রঘুপতি বলি দিয়া দেবীর পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দমাণিক্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সেনাপতি নয়নরায়কে আদেশ করিলেন সৈন্য লইয়া মন্দির রক্ষা করিতে। রঘুপতি রাজাকে ভয় করেন না, তিনি রাজার মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—

আজ নহে মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর একদিন।

রাজা রঘুপতির কথার ও ভয়প্রদর্শনের কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝিতেছিলেন যে মন্দিরের পূজারী রঘুপতি যাহা উচিত বলিয়া মনে করেন তাহা ভ্রান্ত, সেই ভ্রান্তি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। অতএব তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়াতে রাজার উপর তাঁহার রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

সেনাপতি নয়নরায় রাজার আদেশ পালন করিতে অক্ষম এই কথা রাজাকে বিনীত ভাবে জানাইলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, ধর্মের সঙ্গে রাজ-শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, ধর্ম মনোজগতের ব্যাপার, আধ্যাত্মিক ব্যাপার;

* পরবর্তী সংস্করণে জয়সিংহের স্বগত চিন্তা ও পরে অপর্ণার প্রবেশ এবং জয়সিংহের সহিত কথোপকথনের এই অংশটুকু বর্জিত হইয়াছে।

† পরবর্তী সংস্করণে এইখানে দৃশ্যের আরম্ভ। ইহা সেখানে ১-ম অঙ্কের ৫-ম দৃশ্য।

তাহার সঙ্গে বাহ্য বা দৈহিক বলের কোনো সম্পর্ক থাকিতে পারে না। রাজা সেনাপতিকে বলিলেন—কার্যের সমস্ত দায়িত্ব আদেশদাতা প্রভুর,—নির্বিচারে আদেশপালক ভৃত্যের নহে। কিন্তু সেনাপতি বলিলেন—এই কথায় হৃদয় সায় দিতে চায় না। আমি ভৃত্য হইলেও আমি মানুষ,—আমার একটা স্বাধীন সত্তা আছে, বুদ্ধি ও ধর্মাধর্মবোধ আছে, আমি কিছুতেই দেবদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী হইতে পারিব না। তখন রাজা নয়নরায়কে সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া চাঁদপালকে সেই পদ দিলেন। নয়নরায় চাঁদপালকে অস্ত্র দিতে অস্বীকার করিলেন, তিনি রাজার হাতে অস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

বিশ্বাসী ভৃত্য নয়নরায়কে হারাইয়া রাজা দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন এই কথা বলিয়া যে—'ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে।'

জয়সিংহ রাজার পায়ে পড়িয়া তাঁহার বলি নিষেধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দর্পিত রঘুপতি নিজের পুত্রতুল্য জয়সিংহকে রাজার পদানত দেখিয়া জয়সিংহকে ধিক্কার দিলেন, এবং জয়সিংহকে রাজার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। রঘুপতি রাজাকে খর্ব ও অবনত করিতে চাহেন, সুতরাং রাজার কাছে জয়সিংহের অবনতি তাঁহার অসহ্য। রাজা রঘুপতির অহঙ্কার দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তিনি স্মরণ করিলেন না যে তিনিও রাজশক্তির অহঙ্কারকেই আশ্রয় করিয়া বলি বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বৃহৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় আত্মিক বল, দৈহিক বল নহে—ইহা রাজা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং এই দৈহিক বলপ্রয়োগের মধ্যেও যে একটি অন্যায্যতা আছে তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য*—অন্তঃপুরে গুণবতী খেদ করিতেছেন যে তাঁহার পূজা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—

* এ দৃশ্য পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

ধিক্! নারী-জন্ম দীর্ঘ-অপমান শুধু!
সোহাগ যে সেও অপমান, বিরাগ যে
সেও অপমান!

রাণী নিজের প্রতিজ্ঞা-পূরণের পথে বাধা পাইয়া হিতাহিতবোধশূন্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বলির মানৎ রক্ষা না হওয়াতে রাণী নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন, এবং সেই অপমানবোধ তাঁহার রাণীত্বের ও পত্নীত্বের গর্বকে আঘাত করিয়াছে বলিয়া তিনি চাঁদপালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—'নির্বাসিত ক'রে দাও এ রাজারে।' চাঁদপাল বলিল—

শুনে রাখিলাম তব হৃদয়ের
অভিলাষ, ভৃত্য আমি তব অনুগত।

কিন্তু উচ্চস্বরে সে ঘোষণা করিতে লাগিল—সে মহারাজের আদেশ-পালক বিশ্বাসী ভৃত্য।

রাণী রাজভ্রাতা যুবরাজ নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেও আদেশ করিলেন—'তুমি রাজা হও ত্রিপুরার।' কিন্তু নক্ষত্ররায় বুদ্ধিহীন নিরুদ্যম প্রকৃতির। তিনি রাণীর কথার গূঢ় তাৎপর্য কিছুই না বুঝিয়া রাণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাঁচিলেন।

নাটকে সাধারণতঃ পাঁচটি অঙ্ক থাকে; তাহার প্রথম দুই অঙ্কে ঘটনার সূচনা ও দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত দেখানো হয়। তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা জটিল ও সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠে; এবং পরের দুই অঙ্কে সেই সমস্যা শেষ মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয়। যদি সেই মীমাংসা সুখকর হয়, তবে সেই নাটক হয় কমেডি বা মিলনান্তক, আর দুঃখময় বিচ্ছেদ-বিয়োগ-সঙ্কুল হইলে সেই নাটক হয় ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক। এই তৃতীয় অঙ্কে বিসর্জন নাটকের পরিণামের সূচনা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য*—মন্দিরে রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়। রঘুপতি নিজের সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নক্ষত্ররায়কে কপট প্রতারণায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিলেন—

কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

* পরবর্তী সংস্করণে ইহা ২-য় অঙ্কের ১-ম দৃশ্য।

নক্ষত্ররায় বলিলেন যে তিনি রাজা হইলে রঘুপতিকে মন্ত্রী করিয়া দিবেন। রঘুপতি গর্জন করিয়া উঠিলেন—

মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

রঘুপতি সামান্য বৈষয়িক লাভের জন্য এই চেষ্টা করিতেছেন না, তিনি স্বার্থান্বেষী নীচ লোভী নহেন। নক্ষত্ররায় একটু অল্পবুদ্ধি, তিনি জানিতে চাহিলেন যে তিনি কবে রাজা হইবেন? রঘুপতি তাঁহাকে বলিলেন—আগে রাজরক্ত আনিতে হইবে,—দেবী রাজরক্ত চান। নক্ষত্ররায় অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন—রাজরক্ত পাব কোথা? এইবার রঘুপতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে বাড়ীতেই তো রাজা আছেন গোবিন্দমাণিক্য, তাঁহারই রক্ত দেবী চাহেন। এই রাজদ্রোহিতার ও ভ্রাতৃদ্রোহিতার পরামর্শ শুনিয়া জয়সিংহ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা গোপন রঘুপতি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া নক্ষত্ররায়কে বলিতে লাগিলেন—গোপনে রাজাকে বধ করিয়া তপ্ত রাজরক্ত দেবীর চরণে আনিয়া দিতে হইবে। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের নির্বুদ্ধিতাকে ভয় করেন, তাই বলিলেন যে গোপনে কাজ করিতে হইবে। রঘুপতি বলিলেন—'রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে!' রঘুপতি রাজহত্যার একটা দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া নিরুদ্যম নক্ষত্ররায়কে কর্মে তৎপর করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি হত্যার পক্ষে অনুকূল সময়ও বটে ইহাও জানাইয়া দিলেন। রঘুপতি স্বকার্য উদ্ধারের জন্য নক্ষত্রকে দেবীর আদেশ, রাজ্যলোভ, ধর্মভয়, ও অবশেষে তাঁহারও প্রাণের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে কর্মে প্রোৎসাহিত করিতে চাহিলেন,—তিনি বলিলেন যে যদি নক্ষত্র রাজাকে হত্যা করিতে না পারেন, তবে তাঁহারই রক্ত দেবী লইবেন; নক্ষত্রও তো রাজপুত্র বটে! দুর্বলচিত্ত নক্ষত্রকে রঘুপতি বিশ্বাস করিতে ও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই, তাই নানা উপায়ে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

নক্ষত্র রঘুপতির কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—

সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে?
রাজরক্ত থাক রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

নক্ষত্ররায় নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কায় ও রাজাকে বধ করিবার অনিচ্ছায়

এইরূপ উক্তি করিলেন। তিনি স্বভাবত স্থূলবুদ্ধি হইলেও ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীল এবং কোনো কাজ চেষ্টা করিয়া কারবার মতো উদ্যম তাঁহার মধ্যে ছিল না। সেইজন্য অল্পবুদ্ধি অস্থিরমতি নক্ষত্রকে রঘুপতি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে রাজার হত্যাকার্য সম্পাদন নক্ষত্রকেই করিতে হইবে এবং—'যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ!' নক্ষত্র বিদায় হইয়া গেলেন।

রঘুপতি লোকচরিত্রজ্ঞ ও চতুর, তিনি একই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তরে তিন প্রকার ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা লেন—সন্তানহীনা রাণীকে সন্তানলাভের লোভ, ধর্মে আস্থাবান্ নয়নরায়কে ধর্মরক্ষার কর্তব্য, এবং নক্ষত্রকে রাজ্যলোভ দেখাইয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি কতক আত্মগত ও কতক গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

এ কি কথা শুনিলাম! দয়াময়ি, এ কি
কথা! তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী! গুরুদেব, হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার?

জয়সিংহের প্রত্যেকটি কথা কবি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্য প্রণিধানযোগ্য। জয়সিংহ দেবীকে 'দয়াময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কারণ দেবীর দয়াতে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি যদি দয়াময়ী,—তবে চারিদিকে এমন নিষ্ঠুর আয়োজন চলিতেছে কেন? তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তোর আজ্ঞা ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা? দেবতা তো ধর্মরক্ষক, তিনি কেমন করিয়া এমন আদেশ দিতে পারেন? তিনি বিশ্বের জননী হইয়া কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিবেন? এই ঘৃণ্য আজ্ঞা দেবীর হওয়া তো দূরে থাক, জয়সিংহের গুরুরও যদি হয়, তবু তো তাহা ধর্মবিরোধী কার্য! সরল উদারহৃদয় জয়সিংহ এই ব্যাপারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রঘুপতি জয়সিংহের প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া নিজের আচরণ সমর্থনের জন্য বলিলেন,—'আর কি উপায় আছে বলো?' তিনি অধর্মকে ধর্মরক্ষার উপায় বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

জয়সিংহ এতদিন গুরুর কাছে ধর্মাধর্ম বলিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আজ নষ্ট হইয়া যাইতে বসিল। রঘুপতি জয়সিংহের মনের দ্বিধা দেখিয়া কুযুক্তি ও বাক্‌চাতুরী বিস্তার করিয়া জয়সিংহের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহের নষ্টপ্রায় গুরুভক্তি, গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য রঘুপতির এই প্রয়াস। তিনি বলিলেন যে এই জগৎ মহা-হত্যাশালা,—স্বয়ং বিধাতা প্রতি পলে কত কোটি জীব ধ্বংস করিতেছেন!

ইহা শুনিয়া জয়সিংহ স্নেহের অনুযোগ করিয়া দেবী-প্রতিমাকে বলিলেন—

তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী!

তিনি নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন, 'কিন্তু রাজরক্ত?' রাজরক্তের কথা মনে হইতেই জয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন—'ভক্তি-পিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো রক্তপিপাসিনী!' তখন রঘুপতি জয়সিংহকে বলিলেন—'রক্ত হোক্ বলিদান তবে!' জয়সিংহ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, একদিকে দেবীর পূজায় বলিদান চিরাগত প্রথা ও অপর দিকে রাজার নিষেধ ও বাধা; একদিকে 'সরল ভক্তির বিধি' ও অপর দিকে শাস্ত্রবিধি ও গুরুর আদেশ। রঘুপতির কাছে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে সত্যই কি দেবী রাজরক্ত চাহেন, তবে তিনিই সেই রাজরক্ত দিবেন। কিন্তু রাজরক্ত আনিতে যাওয়ার মধ্যে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা আছে,—তাই জয়সিংহের উপর রঘুপতির মমতা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল, তিনি জয়সিংহকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে চাহেন না, দেবীপূজায় বলি দিবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্যও নহে। তিনি জয়সিংহের অনর্গল-আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া বলিলেন—'তোরে আমি নারিব হারাতে।'

জয়সিংহ কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়াও সত্যধর্ম ও গুরুভক্তির সমন্বয় করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রঘুপতি তাঁহার কথাকে আমল না দিয়া বলিলেন,—'সে কথা কল্য হবে স্থির।' তিনি মনে করিলেন যে সময় অতিবাহিত হইলে জয়সিংহের সঙ্কল্প শিথিল হইতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা জয়সিংহকে নিরস্ত করিবারও সময় পাইবেন।

তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের সম্মুখপথ, জয়সিংহ একাকী চিন্তামগ্ন।* জয়সিংহের অন্তরে স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি, সত্যধর্মের আদর্শ, গুরুভক্তি এবং শাস্ত্রবিশ্বাসের মধ্যে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। জয়সিংহ স্বভাবত উদারহৃদয় ও দয়ার্দ্রচিত্ত; কিন্তু তিনি আবাল্য মন্দিরের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকাতে বৃহৎ উদার বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য। এজন্য তাঁহার মানবতা ও চিত্তবৃত্তি সম্যক্ স্ফূর্তি পায় নাই; কিন্তু এখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শে ও অপর্ণার প্রেমের স্পর্শে তাঁহার অন্তরে হিতাহিত চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহা তাঁহাকে বাহিরের মুক্ত ক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ অন্ধভক্তি এবং নির্বিচার বিশ্বাসের গণ্ডি হইতে মুক্তি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। তিনি একবার গুরুর বাক্য সত্য বলিয়া মানিতে চাহিতেছেন, দেবীপূজার বাধা অপসারণের জন্য রাজহত্যা ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে বলিয়া মনকে বুঝাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু জগতের চারিদিকে যে বিশ্বাস ও আনন্দের দৃশ্য দেদীপ্যমান দেখিতেছেন তাহাতে সেই অন্ধ নির্ভরতা ভাঙিয়া যাইতেছে। বিশ্বচ্ছন্দে যোগ দিবার জন্য তাঁহার নির্বাসিত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার চিত্ত যেন আর্তনাদ করিয়া বলিতেছে—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে!
খ'সে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে!

সেইজন্য জয়সিংহ গান ধরিলেন—

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে!

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসী যেমন বুঝিয়াছিল যে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,—

তেমনি জয়সিংহ বুঝিতেছেন যে মানব-সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র পাষাণ-প্রতিমার পাষাণ-মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকাতে জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা নাই। জগতের সবই যদি মিথ্যা ও বৃহৎ বঞ্চনা হইত, তাহা হইলে ধরণী বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যদিও জয়সিংহ মুখে ঠিক ইহার উল্টা কথাটাই অপর্ণাকে বলিলেন, 'তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে সুখী

* ইহা পরবর্তী সংস্করণের ২-য় অঙ্কের ৩-য় দৃশ্য।

হও',—তথাপি তিনি অপর্ণার প্রেমের প্রভাবে আবিষ্ট হইতেছেন, অবশেষে তিনি অপর্ণাকে বলিলেন—

আয় সখি,
চিরদিন চ'লে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে—শূন্য আকাশের
পথে দুই মেঘশিশু সম।

যখন জয়সিংহ মন্দিরের আবেষ্টনকে মিথ্যা বঞ্চনা বলিয়া অনুভব করিতেছেন, যখন প্রেমকেই একমাত্র সত্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন, তখন রঘুপতি আসিয়া জয়সিংহকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু জয়সিংহ গুরুকে বলিলেন, 'তোমারে চিনিনে আমি'। বৃহৎ সত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে জয়সিংহের সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে অপরিচয় ও বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা-রূপী রঘুপতির ডাকে জয়সিংহের চিত্ত এখন আর সাড়া দিতে চায় না। তিনি গুরুর মুখের উপর বলিয়া দিলেন যে, তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার ভিখারিণী সখীর সহিত সরল পথে চলিয়া যাইবেন। অতএব 'কী কাজ শাস্ত্রের বিধি, কী কাজ গুরুতে!' জয়সিংহ সঙ্কীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—মুক্তিটাই স্বপ্ন, আর মন্দিরের আবেষ্টনই সত্য,—নিষ্ঠুর সত্য। তিনি গুরুকে ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি গুরুর আদেশ ভুলেন নাই। দ্বিধান্বিত জয়সিংহ চিরাগত প্রথার ও সংস্কারের মোহমুক্ত হইতে পারিলেন না। অচলায়তনের প্রাচীর তো শীঘ্র ভাঙে না। ক্ষণিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে তিনি কতখানি বদ্ধ। জয়সিংহ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহার আর কি আদেশ আছে? গুরু বলিলেন,—ঐ বালিকাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দাও। রঘুপতি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, অপর্ণা বহির্জগতের দূতী-রূপে আসিয়া জয়সিংহকে বৃহৎ উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। জয়সিংহ গুরুর সমক্ষে স্বীকার করিলেন—

আমারি মতন
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ, নিষ্পাপ, সুন্দর, সরল, শুভ্র,
সুকোমল, স্নেহ-কাতর; দূর ক'রে
দিতে হ'বে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!

জয়সিংহ অপর্ণাকে চলিয়া যাইতে, মরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।—

মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু!

অপর্ণা সংসারে যদি দয়া মায়া স্নেহ প্রেম—এ সকলের কিছুই না পায়, তবে সেই এক সত্য মৃত্যুকে সে লাভ করিবেই, মৃত্যু তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

অপর্ণা জয়সিংহকে আহ্বান করিল—চলো দুইজনে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাই! কিন্তু জয়সিংহ তো যাইতে পারিবেন না,—

দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে!

তিনি গুরুর কাছে যে শপথ করিয়াছেন সেই অঙ্গীকারে তিনি বদ্ধ, তিনি নিজের বাক্যের কারাগারে বন্দী।

অপর্ণা জয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে না। জয়সিংহ তাহাকে বলিলেন,—'এই নারী-অভিমান তোর?' কিন্তু অপর্ণা এখন তাহার প্রতি জয়সিংহের উদাসীনতার কারণ বুঝিতে পারিয়াছে, এখন আর তাহার অভিমান নাই—

অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

অপর্ণা যাইতে অস্বীকার করিল। তখন জয়সিংহ বলিলেন—তুই না গেলে আমি চলিয়া যাইব, অথবা তোর মুখদর্শন করিব না। তখন ব্যথিতা অপর্ণা রঘুপতির ব্রাহ্মণত্বে ধিক্কার দিয়া অভিশাপ দিয়া গেল—

আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিনু তোরে, এ বন্ধনে—
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে!

অপর্ণা ক্ষুদ্রা নারী হইলেও সে প্রেমের শক্তিতে মহীয়সী; প্রেমস্বরূপিণী অপর্ণা আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন, সে জানে যে প্রেম বিশ্ববিজয়ী। তাই সে স্পর্ধার সহিত বলিয়া গেল যে বিশ্বপ্রেম ও অন্ধ সংস্কারের দ্বন্দ্বে প্রেমের জয় অনিবার্য।

রঘুপতি অপর্ণার বিরহে জয়সিংহকে কাতর দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুপতি কুসংস্কার-বশে কঠোর-প্রকৃতি হইলেও একেবারে স্নেহশূন্য নহেন, তাঁহার সমস্ত প্রাণমন অধিকার করিয়া জয়সিংহের প্রতি স্নেহ বিরাজ করিতেছে। তিনি চাহেন যে তিনি যেমন জয়সিংহকে সর্বাতিরিক্ত স্নেহ করেন, জয়সিংহও তেমনি নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই থাকেন, আর কাহারও প্রতি যেন তাঁহার মন আকৃষ্ট না হয়। রঘুপতি কৃপণের ধনের ন্যায়, কাঙালের সম্বলের ন্যায় জয়সিংহকে নিজের স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু যুবক জয়সিংহ এখন কেবল পিতার স্নেহ পাইয়া পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছেন না, রমণীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি গুরুর স্নেহ-প্রকাশের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না—

থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর! কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহ-প্রেম তরু-লতা-পত্র-পুষ্প-সম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ! নিম্নে
শুষ্ক রুঢ় পাষাণের স্তূপ থাকে চির-
রাত্রিদিন, অনন্ত-হৃদয়ভার-সম!

রঘুপতি বুঝিতে পারিলেন না কেন তিনি জয়সিংহের মন আর পাইতেছেন না!

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণে জনতা বলি-বন্ধের কারণ আলোচনা করিতেছে।* একজন বলিল, রাজাকে নিশ্চয় মুসলমানের ভূতে পাইয়াছে, কারণ মুসলমানেরা মূর্তিপূজার বিরোধী। যেখানে যত অমঙ্গল অসুবিধা ঘটিতেছে, কুসংস্কারান্ধ লোকেরা তাহার একই কারণ অনুমান করিতেছে—ভাবিতেছে যে, রাজার দ্বারা বলি-নিষেধই রাজ্যের সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসন্তোষ সম্মিলিত হইলেই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারই পূর্বসূচনা জনতার জল্পনায় পাওয়া যাইতেছে। প্রজাদের মনে রাজার প্রতি বিরাগ ও অবজ্ঞার সহিত ভয়ও মিশ্রিত হইয়া আছে।

জনতা চলিয়া গেল। রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ২-য় অঙ্কের ৪-র্থ দৃশ্য।

দেখিয়া প্রজারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার মুখদর্শন করিতে চাহে না। এমন কি রাণী বিমুখ হইয়াছেন, পুত্রতুল্য প্রিয় জয়সিংহও তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরায়! সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, রাজার সঙ্গী আছে একমাত্র যাহা ধ্রুব, যাহা সত্য, যাহা সহজ সরল, যাহা মহৎ। এই ভাবটিকে বুঝাইবার জন্য রাজার সঙ্গে কেবলমাত্র ধ্রুবকে কবি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা একটি চমৎকার নাটকীয় কৌশল। রাজা সকলের বিমুখতা সহ্য করিতে প্রস্তুত,

কিন্তু প্রেম ক্ষুব্ধ হ'য়ে
সম্মুখে দাঁড়ায় যবে, সে বড় দুঃসহ
বাধা।

রাজার সঙ্গে ছিল ধ্রুব, সত্যের প্রতীক। কিন্তু সে প্রবঞ্চক ও মিথ্যার প্রতিমূর্তি চাঁদপালকে আসিতে দেখিয়া পলায়ন করিল, চাঁদপালকে সে বড় ভয় করে। চাঁদপাল আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে রঘুপতি ও যুবরাজ নক্ষত্ররায় মিলিয়া রাজাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিয়াছেন, এবং নক্ষত্র দেবতার কাছে রাজরক্ত আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—

দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।

রাজা চাঁদপালকে বিদায় দিয়া দেবী-প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
... ... হিংসা নহে,
বিভীষিকা নহে, শুধু ভক্তি, শুধু প্রেম!

রাজা পত্নীর বিরূপতা, ভ্রাতার বিপক্ষতা, প্রজার অসন্তোষ দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তিনিই সকল অনর্থ ও অশান্তির মূল। নিঃস্নেহ জীবন-ধারণে কোনো আনন্দ নাই; অতএব তাঁহার মৃত্যুতে যদি সকল উপদ্রবের শান্তি হয় তো তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু—

রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভাইয়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!

জগতে যেখানে যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হোক না কেন, তাহার আঘাত বিশ্বপ্রাণে গিয়া লাগে; একস্থানের রাজদ্রোহিতায় সকল দেশের প্রজাদের অকল্যাণ হয়, এক ভাইয়ের অপকর্মের দ্বারা জগতের সকল ভ্রাতৃত্ব নিপীড়িত হয়। কিন্তু এই হত্যার দ্বারা দেবতার নামে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে,—

মোর রক্তে হিংসায় ঘুচিবে ধাতুবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার।

সকল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব রাজার প্রাণ দিলে যদি সত্যধর্ম স্ব-রূপে প্রকাশিত হয় তবে তাহাও শ্লাঘ্য। সত্যপ্রচারকের আত্মদানেই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে যুগে যুগে।

এমন সময়ে জয়সিংহ আসিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?' জয়সিংহ গুরুর আদেশ ধ্রুবসত্য ও কল্যাণময় বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না, তাই তিনি দ্বিধান্বিত চিত্তে দেবীর সমর্থন প্রার্থনা করিলেন। তিনি রাজাকে একাকী পাইয়াও হ্যামলেটের মতন বধ করিতে পারিলেন না, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করিলেন। রঘুপতি দেবী-প্রতিমার অন্তরাল হইতে দেবীর প্রত্যাদেশ বলিয়া নিজের ইচ্ছা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সত্যদর্শী রাজা গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতির মিথ্যা প্রবঞ্চনা জয়সিংহের নিকটে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। জয়সিংহ আর দ্বিধার মধ্যে ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে পারিতেছিলেন না, তিনি যাহা হয় একটা কিছু করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে বাঁচেন, যে অবিশ্বাস-দৈত্য তাঁহাকে কূল হইতে অকূলে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাকে তিনি বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, যে অবিশ্বাস-দৈত্য তাঁহাকে অন্যায়-অনুষ্ঠানে দ্বিধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্বেরই কল্যাণময়ী শক্তির বিকাশ। ভ্রান্ত ও শ্রান্ত জয়সিংহ গুরুর প্রবঞ্চনা জানিয়াও আর দ্বিধার মধ্যে আন্দোলিত হইতে চাহেন না, তাই তিনি বলিলেন, 'গুরু হোক, কিংবা দেবী হোক, একই কথা!' এই বলিয়া তিনি ছুরিকা উন্মোচন করিলেন; কিন্তু তিনি তো অমানুষ নহেন, তিনি অন্যায় রক্তপাত করিতে পারিলেন না, তিনি কাতর কণ্ঠে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর

পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুষ্ট
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে'
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো।

জয়সিংহের মনুষ্যত্ব ও শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার আবাল্য-পোষিত সংস্কারের উপর জয়ী হইয়া উঠিল। এমন সময়ে অপর্ণা আসিয়া জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে আহ্বান করিল। অমনি আবার জয়সিংহের মনে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

জয়সিংহ ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল। রঘুপতি আসিয়া জয়সিংহকে ভর্ৎসনা করিলেন—

সব ভেঙে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হ'তে। লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ ক'রে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হ'তে বড়!

'রাজা ও রাণী' নাটকের রাজ-বয়স্য দেবদত্ত ত্রিবেদীর ব্রহ্মশাপ লাভ করিয়া সঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরে শুনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না।' এখানে রঘুপতি নিজের অজ্ঞাতসারে সেই প্রকার বিদ্রূপাত্মক কথাই বলিয়া ফেলিলেন—রঘুপতির ব্রহ্মশাপে তো রাজা মরিবেন না, তাই জয়সিংহকে দিয়া সেই ব্রহ্মশাপ ফলাইবার চেষ্টা! রঘুপতি কিন্তু একটি সত্য কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে জয়সিংহ আপন বুদ্ধিকে সকল হইতে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুর অন্যায় আদেশ অথবা দেবীর নামে মিথ্যা আদেশ হইতে এবং সংস্কারের অন্ধতা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত জয়সিংহ আবার গুরুর বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্পিত কর্তব্য-পালনে অক্ষমতার জন্য গুরুর নিকটে প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করিলেন। তিনি নিজের প্রাণদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রঘুপতি তো জয়সিংহের প্রাণ চাহেন না, তিনি তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দিবেন বলিয়া দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইলেন,—তাঁহাকে দিয়া বলাইলেন—

আমি এনে দিব রাজরক্ত,
শ্রাবণের শেষ রাত্রে, দেবীর চরণে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—রঘুপতি জনতাকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে প্ররোচনা দিতেছেন।* তিনি দেবী প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সেই বিমুখী প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, রাজার অনাচারে দেবী বিমুখী হইয়াছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরের বুদ্ধিতে চালিত, সাধারণ লোকদিগকে রঘুপতি ভয় দেখাইয়া রাজবিদ্রোহী করিবার সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু জয়সিংহের মনে সন্দেহ উঁকি মারিতেছিল যে ইহার মধ্যে দৈবীশক্তি অপেক্ষা মানবীয় ধূর্ততা অধিক প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু জয়সিংহ তাঁহার গুরু রঘুপতির সহিত কোন কথা আলোচনা করিবার অবসর পাইলেন না। জয়সিংহকে লইয়া রঘুপতি মন্দির হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজা আসিলেন। রাজার নিকটে সকল লোক দেবীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবেদন করিল। রাজা প্রজাদিগকে, বিশেষ করিয়া নারীদিগকে, মাতৃত্বের পবিত্র স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন এবং সেই মাতৃত্ব-ভাবের সহিত পাষাণপ্রতিমার রাক্ষসীভাবের তুলনা করিয়া বলিলেন যে, যদিও বিশ্বমাতার চক্ষুর সম্মুখে বহু হত্যা ও অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি বিশ্বজননীর মাতৃভাব চিরন্তন হইয়া বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রজারা মূর্খ, তাহারা যুক্তিতর্ক বুঝে না, দার্শনিকতা বুঝে না; তাহারা চিরাগত প্রথা সংস্কার ও বাহ্য স্থূল ব্যাপার দ্বারা নিজেদের মত গঠন করে। রাজার যুক্তিতর্কে প্রজাদের মনের সন্দেহ ঘুচিল না। কিন্তু যখন অপর্ণা প্রতিমার মুখ মন্দিরের দ্বারের দিকে ফিরাইয়া দিল, তখন দেবতার প্রসন্নতা অনুমান করিয়া তাহারা তুষ্ট হইল। জনসাধারণ চাক্ষুষ প্রত্যয়কেই বড় বলিয়া মনে করে। রাজা বুদ্ধির মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোককে তাহার অনুপযুক্ত দেখিয়া অপর্ণা স্থূল চাক্ষুষ উপায়ে তাহাদের প্রত্যয় প্রত্যানয়ন করিল। সকলে জয়জয়কার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল।

জয়সিংহ মোহমুক্ত হইয়াও আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। রঘুপতির সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা সম্বন্ধে তাঁহার সংশয়

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য।

উপস্থিত হইয়াছে, তিনি আর গুরুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, অথচ তাঁহার মনে এমন বল নাই যে স্পষ্ট করিয়া গুরুকে ইহার জন্য দোষী করেন অথবা গুরুকে পরিত্যাগ করেন। তাই তিনি গুরুর মুখ হইতে শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য বলো প্রভু, তোমারি এ কাজ?' রঘুপতি প্রজাদের কাছে যে মিথ্যা আচরণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ জয়সিংহের কাছে তাহা টিকিবে না বুঝিয়া তিনি সত্য কথা অকপটে স্বীকার করিলেন! তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, জয়সিংহের মনে গুরুর আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয়ের উদয় হইয়াছে; ইহা জয়সিংহের প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। পাছে জয়সিংহ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যান, রঘুপতির মনে এই ভয় অনেক দিন হইতে জাগিতেছিল। তাই তিনি অপর্ণাকে ভয় করেন, রাজার প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধাকে ভয় করেন। রঘুপতি কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া জয়সিংহকে স্তোক দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি যে প্রজাদের প্রতারণা করিবার জন্য প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, সাধারণ মূর্খ লোকে 'চোখে চাহে দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়!' 'মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই!' গুরুর কুতর্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া জয়সিংহ আবার সংশয়ে নিমগ্ন হইলেন, গুরু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন,—কোথাও কোনো সত্য নাই, সমস্তই মিথ্যার মায়া, সেই মহামিথ্যারই নাম মহামায়া!

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য*—প্রাসাদকক্ষে চাঁদপাল আসিয়া রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যকে সংবাদ দিয়া গেল যে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে। চাঁদপাল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং রাজার বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য রাজাকে মাঝে মাঝে এক-একটা বিপদের সংবাদ দিয়া সাবধান করে।

রাণী আসিলেন। রাজা যখন বাহিরের বিদ্বেষের পরিচয়ে ব্যথিত, তখন তিনি রাণীর প্রেমের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাণী তাঁহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন।

নক্ষত্ররায় আসিলেন। ধ্রুব বালক, খেলাচ্ছলে সেখানে আসিয়া রাজার মুকুট চাহিল। রাজা তাহার মাথায় সেটি পরাইয়া দিলেন। ধ্রুব তখন

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্য।

নক্ষত্ররায়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকা, তুমি রাজা হবে? এই যে মুকুট!' ধ্রুবের এই কথার মধ্য দিয়া কবি নাটকীয় ঘটনার পূর্বাভাস দিয়াছেন। ধ্রুবের কথা শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে রঘুপতির প্রলোভনের কথা উদয় হইল। তিনি রাজা হইতে উৎসুক, কিন্তু রাজাকে হত্যা করিবার মতন উৎসাহ তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি ধ্রুবের কথা শুনিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার রাজা হইবার জন্য যে রাজরক্ত চাই,—তাহা কেমন করিয়া কে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে?

রাজা ইতিপূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে নক্ষত্র তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রঘুপতির সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। এখন নক্ষত্ররায়কে উন্মনা দেখিয়া ভাইকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি রাজাকে হত্যা করিবার অবসর খুঁজিতেছেন। রাজা ভাইকে কাতর স্বরে মধুর ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

> এই বক্ষ ক'রে দিনু
> দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার
> অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম!

নক্ষত্র চিরকালই ভ্রাতৃবৎসল, তাহার উপর ভ্রাতার উদার আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণ নক্ষত্রকে একেবারে অভিভূত করিয়া জয় করিল; তিনি ভ্রাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং ক্ষমা লাভ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

> রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষ মোরে
> তার কাছ হ'তে।

দুর্বলপ্রকৃতি নক্ষত্ররায় রঘুপতির দুষ্ট প্রভাব হইতে ভ্রাতার দৃঢ়তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা ভাইকে অভয় দিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, অন্তঃপুরের কক্ষ*—রাণী গুণবতী একাকিনী চিন্তামগ্না, তিনি ভাবিতেছেন—

> শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
> শুধু শোভাময়-আভাময়, তাপ নাহি
> তাহে, হীরকের দীপ্তি-সম। ধিক্ থাক
> শোভা! এ রোষ বজ্রের মতো হ'ত যদি,

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য।

পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হ'ত রাজ-অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা।

রাণী ভাবিতেছেন যে পুরুষ নারীর রোষের শোভা দেখিয়া আনন্দ বোধ করে, কিন্তু সেই রোষে জ্বালা ও আঘাত না থাকাতে তাহারা যাতনায় অধীর হইয়া নারীর অধীন হয় না। রাণী আপনার রাণী-মহিমার অভাব অনুভব করিয়া অধীর হইয়াছেন। এমন সময়ে দেখিলেন ধ্রুব রাজার কাছে যাইতেছে। রাণী যখন কল্পনায় নিজেকে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ, তখন তিনি ধ্রুবকে রাজার কাছে যাইতে দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, রাজা সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিজের ক্ষুব্ধ চিত্তকে বিনোদিত করিবার জন্য এই সরল শিশুর সাহচর্যই আশ্রয় করিয়াছেন। সে শিশু তো কোনো স্বার্থবুদ্ধির বা সংস্কারের বশীভূত নহে, সে কেবল অনাবিল প্রীতির বশ। কিন্তু রাণী মনে করিলেন যে, ঐ অনাথ বালক অজ্ঞাত রাজপুত্রের প্রাপ্য পিতৃস্নেহ উচ্ছিষ্ট করিয়া রাখিতেছে। তিনি ঈর্ষায় কাতর হইয়া আবার দেবীর কাছে একটি শিশু পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাণী দেখিলেন—সেইদিকে নক্ষত্র আসিতেছেন। রাণী নক্ষত্রকে আহ্বান করিতেই নক্ষত্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'আমি রাজা নাহি হবো!' চারিদিকে সকলে তাঁহাকে রাজা হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে, অথচ তিনি তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিতে অক্ষম এবং রাজাও তাঁহার এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিয়া বসিয়া আছেন, এইজন্য নক্ষত্ররায় আগেই রাজা হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। নক্ষত্র রাণীর সঙ্গে কথা বলেন, আর কেবলই সেই রাজা হইতে অনিচ্ছার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁহার মনে রাজা হইবার ইচ্ছা আছে অথচ উদ্যম নাই, এই জন্য দ্বিধা পদে পদে। রাণী নক্ষত্রকে ধ্রুবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নক্ষত্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ধ্রুব রাজমুকুট মাথায় পরিয়া খেলা করে, কোন্ দিন সেই মুকুট সে-ই অধিকার করিয়া বসিবে, যুবরাজ ফাঁকিতে পড়িবেন। অতএব নক্ষত্রের উচিত তাঁহার পথের ঐ ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ কণ্টকটিকে উৎপাটন করিয়া অপসারণ করা। দুর্বলপ্রকৃতি ও অল্পবুদ্ধি নক্ষত্র রাণীর কথা মুখস্থ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য—মন্দিরের সোপানে জয়সিংহ বসিয়া চিন্তা

করিতেছেন।* এতদিন পর্যন্ত দেবীপ্রতিমাকে সত্য জানিয়া তিনি যে নির্ভর পাইয়াছিলেন, এখন রঘুপতির বাক্যে ও ব্যবহারে সেই প্রতিমা অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াতে দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হারাইয়া তিনি একান্ত নিরাশ্রয় ও অবলম্বন-রহিত বোধ করিতেছেন। তাঁহার মনে এই খেদও উদিত হইয়াছে যে এই মনুষ্যজীবনের দুর্লভ ঐকান্তিক ভক্তি শ্রদ্ধা তিনি ঐ ক্ষুদ্র জড়স্তূপ মিথ্যার পদে দান করিয়া নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়াছেন। এমন সময়ে অপর্ণা আসিয়া উপস্থিত। বাহ্য জগৎ বৃহৎ উদার সত্য ও প্রেম লইয়া বারংবার অপর্ণার রূপে জয়সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে প্রমুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। জয়সিংহ এখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তারতম্য অনুভব করিতেছেন, তিনি দুঃখসন্তপ্ত স্বরে বলিলেন—'অপর্ণা, দেবী নাই।' অপর্ণা জয়সিংহকে বলিল—'জয়সিংহ, তবে চ'লে এসো, এ মন্দির ছেড়ে।' অর্থাৎ, যদি তুমি সত্যই বুঝিয়া থাকো যে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী বন্দী হইয়া নাই, তবে আর এখানে আবদ্ধ হইয়া থাকার তো কোনো তাৎপর্য ও অর্থ নাই। অপর্ণা জয়সিংহের পরিবর্তনে ও মোহভঙ্গে সুখী হইয়া তাঁহাকে এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়া অন্ধভক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিল।

কিন্তু জয়সিংহ যদিও মিথ্যার মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তথাপি কৃতজ্ঞতার ঋণ হইতে তো এত সহজে মুক্ত হইতে পারেন না, তাই তিনি বলিলেন—

যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাবো।

অপর্ণা জয়সিংহের কাছে প্রেমের ও সত্যের বার্তা বহন করিয়া বারংবার আহ্বান করিতেছে, তাহার আকর্ষণ বড় শোভন ও বড় লোভন। কিন্তু তাঁহার শপথ-করা কর্তব্য তো এখনো সম্পাদন করা হয় নাই! সেই কর্তব্যকেই তিনি সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের উপর সেই কর্তব্য প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তিনি এখন আর স্বাধীন নহেন।

জয়সিংহের এই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান শুনিয়া অপর্ণা আজ কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিল—

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য।

শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে। আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ।

প্রেম অশুভঙ্করী। জয়সিংহের অস্পষ্ট কথায় অপর্ণার মনে একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য—নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নিদ্রিত ধ্রুবকে চুরি করিয়া মন্দিরে হত্যা করিতে আনিয়াছেন।* রাণীর প্ররোচনায় নক্ষত্র যুবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ধ্রুবকে হত্যা করিতে উদ্যত, আর রঘুপতি রাজার প্রিয়পাত্র বালককে হত্যা করিয়া রাজাকে কষ্ট দিতে পারিবেন এই আশায় হত্যাকর্মে প্রবৃত্ত। কিন্তু যাঁহারা পাপকর্মে নূতন ব্রতী তাঁহাদের সেই কর্মে তৎপরতা হয় না। রঘুপতি এই শিশুকে দেখিয়া তাঁহার পালক-পুত্র জয়সিংহের শৈশব মনে করিতেছেন, সেই শিশু-জয়সিংহের প্রতি মমতার স্মৃতি আজ এই শিশুর প্রতিও তাঁহাকে মমত্বশালী করিয়া তুলিতেছে। তিনি বলিলেন—

কেঁদে কেঁদে ঘুমায়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন।.....
ওরে দেখে
তার সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

এই শিশুর ক্রন্দন রঘুপতির কঠিন চিত্তকে আর্দ্র করিয়াছে। তাই তিনি প্রথমেই শিশুর ক্রন্দনের কথাই উল্লেখ করিলেন। জয়সিংহের প্রতি স্নেহ রঘুপতির মনে সমাবস্থ শিশুর প্রতি স্নেহ উদ্রেক করিয়া দিতেছে।

কিন্তু নক্ষত্ররায়ের ধরা পড়িয়া যাইবার জন্য ভয় হইতেছে, তিনি সত্বর হত্যা-কার্য সমাধা করিতে ব্যগ্র হইয়া রঘুপতিকে তাগাদা দিতে লাগিলেন। যাহারা পাপকার্যে অভ্যস্ত নহে, তাহারা পাপকর্মের সম্মুখীন হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে; তখন কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা হিতাহিত-বিবেচনা আচ্ছন্ন করিতে হয়। সেইজন্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন—'এসো পান করি কারণ-সলিল, এসো পান করি আনন্দ-সলিল।' অতঃপর তিনি নিজে মদ্যপান করিলেন।

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য।

নক্ষত্র মদ্যপানে ও হত্যাসাধনে উভয় কর্মেই দ্বিধান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন—'আমি বলি, আজ থাক, কাল পূজা হবে।'

নক্ষত্রকে নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ দেখিয়া রঘুপতি আনন্দ-সলিল পান করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন এবং নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পান করিতেছিলেন। মদ্যপানে তাঁহার চেতনা আচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু নক্ষত্র মদ্য পান না করাতে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় ছিল, এবং ভয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি তীক্ষ্ণও হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কাহার পদধ্বনি শুনিয়া ও আলোক দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং রঘুপতিকে সাবধান করিলেন।

রঘুপতি সচেতন হইয়া দেখিলেন রাজা উপস্থিত হইয়াছেন। তখন আর কালক্ষেপের সময় নাই, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। রাজা ও প্রহরিগণ সত্বর আসিয়া রঘুপতিকে ও নক্ষত্ররায়কে বন্দী করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—বিচারসভা।* রাজা রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি অপরাধ স্বীকার করিবেন কি না! রাজার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য,—অপরাধ স্বীকার করিলে রঘুপতিকে তিনি লঘুদণ্ড দিবেন। কিন্তু রঘুপতি সে চরিত্রের লোক নহেন,—তিনি ভগ্ন হন, কিন্তু নত হন না। তিনি অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং দেবতার নামে নিজের কর্ম সমর্থন করিয়া বলিলেন—

অপরাধ করিয়াছি বটে; দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মুগ্ধ হ'য়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি শুধু উপলক্ষ!

রাজা তো পূর্বেই প্রচার করিয়াছিলেন যে যে-ব্যক্তি দেবতার কাছে বলি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহার প্রতি নির্বাসন-দণ্ড হইবে। রঘুপতির প্রতি রাজা সেই দণ্ড দিলেন।

তখন রঘুপতি রাজার কাছে নতজানু হইয়া শ্রাবণের শেষ রাত্রি পর্যন্ত অবসর প্রার্থনা করিলেন এবং তাহার পরে শরতের প্রথম প্রত্যূষে ভাদ্রের প্রথমেই অগস্ত্যযাত্রা করিয়া দেশ ছাড়িয়া যাইবেন, আর কখনো এদিকে মুখ ফিরাইবেন না।

রাজার রক্ত দিতে প্রতিশ্রুত জয়সিংহের প্রতিজ্ঞা-পালনের আর দুই দিন

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্য।

মাত্র বাকি ছিল, তাই গর্বিত ব্রাহ্মণ রঘুপতি অ-ব্রাহ্মণ নরপতির সম্মুখে নতজানু হইলেন। রাজার মৃত্যু-দর্শনের শুভ দিন না দেখিয়া রঘুপতি দূরে যাইতে অক্ষম। আর, রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে হয়তো আর নির্বাসনে যাইতে না হইতেও পারে। রাজা রঘুপতির প্রার্থনা-অনুসারে তাঁহাকে দুইদিন সময় দিলেন। তখন রঘুপতি ব্যঙ্গের স্বরে রাজাকে বলিলেন—

মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
মহিমা-সাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি দীন অভাজন।

নক্ষত্রকে রাজা দোষ স্বীকার করিতে আদেশ করিলেন। নক্ষত্র রাজার পদতলে পতিত হইয়া দোষ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ক্ষমা চাহিতে সাহস করিলেন না। রাজা জানিতেন যে, নক্ষত্র নিজের প্রেরণায় এই কাজে উদ্যত হন নাই, তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার প্ররোচনায় তিনি এই গর্হিত কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নক্ষত্র গুণবতীর নাম প্রকাশ করিলেন না। গুণবতীর নাম প্রকাশ করিলে রাজা ব্যথা পাইবেন, রাজা রাজকর্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া গুণবতীকে দণ্ড দিবেন এবং সেই দণ্ড দিয়া রাজা নিজে দণ্ডিত হইবেন এবং রাণীর অপমানে নিজে অপমানিত হইবেন,—এইসব ভাবিয়া নক্ষত্র রাণীর কুমন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিলেন না, সব দোষ নিজের উপরে লইলেন। ইহার দ্বারা কবি নক্ষত্রের ভ্রাতৃস্নেহ এবং তাঁহার স্বাভাবিক সততা নাটকীয় কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার বিচার-সভার সকলে নক্ষত্রকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা ন্যায়নিষ্ঠ, তিনি বলিলেন—

ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হ'তে বেশী বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার,...

রাজা নক্ষত্ররায়কে আদেশ দিলেন যে, ত্রিপুররাজ্যের বাহিরে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে মাতার তীর্থস্নানের জন্য যে রাজগৃহ আছে, সেইখানে নক্ষত্র নির্বাসনের আট বৎসর যাপন করিবেন। ভ্রাতৃস্নেহ রাজদণ্ডকে কোমল করিয়া দিল, রাজা রঘুপতির ন্যায় নক্ষত্রকে নিরুদ্দেশ বিশ্ববক্ষে বিসর্জন দিতে পারিলেন না।

রাজা সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া নক্ষত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। সিংহাসনে কেবল ন্যায় অধিষ্ঠিত, সেখানে এতটুকু মমতা দয়ার স্থান নাই বলিয়া রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন।

রাজা রাজসভা হইতে সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন, ভ্রাতৃবিচ্ছেদের শোক একাকী বিরলে অনুভব করিবেন বলিয়া। এমন সময়ে রাজার পদচ্যুত পূর্বতন সেনাপতি নয়নরায় দ্রুত প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন যে, চাঁদপাল প্রজা-বিদ্রোহের সুযোগ পাইয়া মোগলের সৈন্যের সাহায্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাজা চাঁদপালের নামে এই অপবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, নয়নরায় পূর্ব-বৈরিতা স্মরণ করিয়া চাঁদপালের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। নয়নরায় রাজার এই অবিশ্বাসে মর্মাহত হইয়া বলিলেন—

অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।

নয়নরায় রাজার বলি-নিষেধের বিধান সমর্থন করিতে পারেন নাই বলিয়া রাজা তাঁহাকে শত্রু ভাবিতেছেন,—রাজার এই অবিশ্বাস নয়নরায়কে আঘাত করিল।

রাজা আবার নয়নরায়ের কাছে চাঁদপালের বিশ্বাসঘাতকতার বার্তা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কোন্ ছিদ্রপথে এইসব অনর্থ উৎপাত হইতেছে। সেই ছিদ্রপথ যে রাজারই রাজশক্তির দম্ভ, তাহা তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধ প্রেমের দ্বারা না করিয়া বলের দ্বারা করিতে গিয়া বিরোধের বিপক্ষে বিরোধ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। রাজা নয়নরায়কে আবার সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণে জয়সিংহ ও রঘুপতি কথা কহিতেছেন।* রঘুপতি ব্রাহ্মণ হইয়া অ-ব্রাহ্মণ রাজার কাছে নতজানু হইয়া দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন, সেই অপমান তাঁহাকে পীড়া দিতেছে। তিনি জয়সিংহকে বলিতেছেন যে তিনি আর জয়সিংহের গুরু নহেন, তিনি গুরুর আদেশ করিতেছেন না, কেবল তিনি ভিক্ষা চাহিতেছেন। আশৈশব জয়সিংহকে যে তিনি পালন করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জয়সিংহ গুরুকে গুপ্তঘাতক পাপাচারী দেখিয়া তাঁহার প্রতি আর

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্য।

ভক্তিশ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাই তিনি জয়সিংহের কৃতজ্ঞতার কাছে অনুনয় করিতেছেন। জয়সিংহের কাছে তিনি যে ভিক্ষা করিতেছেন, তাহাও তাঁহাকে পীড়া দিতেছে—

কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে!

জয়সিংহ গুরু ও পিতার কাতর অনুনয়ে ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে দেবী যখন রাজরক্ত চাহিতেছেন, তখন তিনি তাহা আনিয়া দিবেনই। ইহাতেও রঘুপতি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। কারণ, জয়সিংহ দেবীর আদেশ পালন করিবেন, গুরুর আদেশ নহে। দেবী জয়সিংহের কি করিয়াছেন, আর তিনি কি না করিয়াছেন? তাছাড়া, জয়সিংহের এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা তাঁহার বুকে যতখানি বাজিয়াছে, দেবীর বুকে কি ততখানি বাজিয়াছে!

পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য*—প্রাসাদকক্ষ; রাজা সেখানে উপস্থিত, নয়নরায়ের প্রবেশ—নয়নরায় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তিনি বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন সময়ে জয়সিংহ আসিলেন। রাজা মনে করিলেন যে জয়সিংহ ক্ষত্রিয় যুবা, তিনি বোধ হয় যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু জয়সিংহ রাজার কাছে বিদায় চাহিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন তাহা বলিলেন না, এবং রাজাকেও সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা জয়সিংহকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন,—কারণ, রাজা নিজে যুদ্ধে যাইতেছেন, ফিরিয়া আসিবেন কি না কে জানে! জয়সিংহও রাজাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া কোলাকুলি করিলেন ও প্রস্থান করিলেন।

এমন সময়ে একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল যে নক্ষত্ররায়কে নির্বাসনের পথ হইতে মোগলেরা কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে বরণ করিয়া সৈন্য লইয়া ত্রিপুরারাজ্য দখল করিতে আসিতেছে। নয়নরায় সেনাপতি—তিনি যুদ্ধ করিতে চাহেন; কিন্তু রাজা ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক,—তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ও অনর্থক লোকক্ষয় নিবারণের জন্য যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ। রাজা গোবিন্দমাণিক্য এখানে ভ্রাতৃদ্রোহের আঘাতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া

* পরবর্তী সংস্করণে ৪র্থ অঙ্কের ৩য় দৃশ্য।

ভুল করিলেন—নক্ষত্ররায় যে মোগলের দাস ও ক্রীড়নক হইয়া স্বদেশকে পরপদানত করিবেন এবং তাহাতে স্বদেশের যে অমঙ্গলই হইবে, ইহা রাজা ভাবিয়া দেখিলেন না। বিচক্ষণ রাজার ইহা মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃদ্রোহের আঘাতে তাঁহার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। হয়তো বা তিনি তাঁহার রাজ্যের নানা বিক্ষোভে ক্লান্ত হইয়া রাজার গুরু-কর্তব্যভার হইতে নিষ্কৃতিলাভের এই সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন! রাজা মাথা হইতে মুকুট উন্মোচন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—এইবার আর কোনো ক্ষমতা তাঁহার রহিল না, অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবার বা নিষেধ করিবার ক্ষমতা এই মুকুট ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য; মন্দিরের সম্মুখ। রাত্রিকাল, ঝড়বৃষ্টি হইতেছে।*

শ্রাবণের শেষ রাত্রি। রঘুপতি রাজরক্তের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। তিনি জয়সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অপর্ণা আসিল। রঘুপতি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। 'রঘুপতির সন্দেহ যে শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ হয়তো রাজহত্যা করিতে সম্মত হইবেন না, তাই তিনি দেবীর কাছে বর চাহিতেছেন যেন দেবীর ভক্তবৎসলা নামে যেন কোনো কলঙ্ক স্পর্শ না করে। দেবীকে ভক্তবৎসলা সম্বোধন করার মধ্যেও dramatic irony আছে। দেবী যে ভক্তির বশ, হিংসার সমর্থনকারিণী নহেন, এই কথাই রঘুপতি নিজের অজ্ঞাতসারে প্রচার করিলেন। রঘুপতি দেবীকে ভয়ঙ্করী আবার অভয়া, সর্বজয়ী ও সিদ্ধিদাত্রী নামে অভিহিত করিতেছেন; রাজার ছিন্ন-মুণ্ড দেখিবার আশায় দেবীকে সম্বোধন করিতেছেন—

জয় মুণ্ডমালিনী!
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

সে শক্তি রাজশক্তির উপরও জয়ী হইতে পারে!

জয়সিংহ দ্রুত-পদে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে রাজরক্তের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া রঘুপতি উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ বলিলেন—রাজরক্ত তাঁহার ধমনীতেই আছে, তাঁহারা রাজপুত, তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন, তিনি নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেবীর রক্তপিপাসা ও গুরুর আদেশ মিটাইয়া দিবেন।

* পরবর্তী সংস্করণে ৫-ম অঙ্কের ১-ম দৃশ্য।

রাজরক্ত আছে এই
দেহে! এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে যেন শেষ মিটে
যায় তোর অনন্ত পিপাসা!

এই উক্তি করিয়া জয়সিংহ আপন বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন।

জয়সিংহ গুরুর আদেশ ও নরহত্যার প্রতি ঘৃণার সমন্বয় করিলেন আত্মদানে। গোবিন্দমাণিক্যের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুর নিকটে কৃতজ্ঞতার সমন্বয় করিলেন আপনাকে বলি দিয়া। ইহার দ্বারা গুরুর আদেশ-পালন ও নিজের মনুষ্যত্ব-রক্ষা দুইই হইল।

জয়সিংহকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া রঘুপতির স্নেহসন্তপ্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, জয়সিংহের মহৎ আত্মত্যাগে আঘাত পাইয়া রঘুপতির মনুষ্যত্ব উদ্বোধ লাভ করিল। অপরের ক্ষতি মানুষের চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে না, কিন্তু সেই ক্ষতি যখন তাহার নিজের হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে সেই সামান্য ক্ষতি অপরের কাছে কেমন অসামান্য মনে হইতে পারে! রক্ত-দর্শনে হাসির ও ধ্রুবের ভীতি দেখিয়া ও ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার ক্রন্দন দেখিয়া রাজার চেতনা হইয়াছিল; কিন্তু রঘুপতির চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য জয়সিংহের ন্যায় একটি মহাপ্রাণ বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। রঘুপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণত্ব সব বিসর্জন দিয়াও এখন জয়সিংহকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অপর্ণা জয়সিংহের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে পুনরায় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আজ এই প্রথম রঘুপতি কোমল মিষ্ট স্নেহপূর্ণ স্বরে আহ্বান করিলেন—

আয় মা অমৃতময়ি! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে... ... ...
তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

অপর্ণা জয়সিংহের প্রিয়, তাহার প্রেমের সঞ্জীবনী-শক্তির দ্বারা সে জয়সিংহকে পুনর্জীবন দান করুক—এই আশায় রঘুপতি অপর্ণাকে 'অমৃতময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাহার কণ্ঠের আহ্বানকে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সহিত তুলনা করিলেন। অপর্ণা যদি জয়সিংহকে জীবিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহাই রঘুপতির কাছে যথেষ্ট; তিনি তাহাকে নিজের কাছে যদি নাও রাখিতে পারেন, তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ আছে। অপর্ণা জয়সিংহকে মৃত দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

রঘুপতি পাষাণপ্রতিমার পায়ের উপর মাথা কুটিয়া কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'ফিরে দে। ফিরে দে!' কিন্তু পাষাণীর কোনো সাড়া না পাইয়া তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে এই প্রতিমা পাষাণ মাত্র, জড় পাষাণের স্তূপ, মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির!

রঘুপতি এতদিনের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেবীপ্রতিমাকে গোমতী নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা পাষাণমন্দির হইতে ও মনোমন্দির হইতে দেবতার বিসর্জন! বলিষ্ঠ হৃদয়ের ভক্তি যখন সচেতন হইয়া উঠিল, তখন রঘুপতি ঐ পাষাণস্তূপকে আর স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহা নিজের অতীত মূঢ়তার ধিক্কারে প্রতিহিংসার আকার ধারণ করিল।

গুণবতী পূজা লইয়া মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন দেবী নাই। তিনি মনে করিলেন, দেবী বুঝি উপযুক্ত পূজার অভাবে কুপিত হইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা দেবী?' ইহার উত্তরে রঘুপতি বলিলেন—

দেবী বলো তারে?
পুণ্য রক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে ম'রে গেছে।

দেবীপ্রতিমা যতদিন ছাগরক্ত পান করিতেছিল, ততদিন তাহা রঘুপতির কাছে সত্য দেবীর ভক্তি পাইতেছিল। সেই দেবীপ্রতিমার কাছে তিনি রাজাকে বলি দিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই প্রতিমা রঘুপতির প্রিয় জয়সিংহের রক্তপান করায় রঘুপতি তাহাকে রাক্ষসী বলিয়া মনে করিতেছেন। রাণী গুণবতী রঘুপতির কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া কাতর হইয়া বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেবী নাই?' যখন রঘুপতি বারংবার সেই একই উত্তর দিলেন, তখন রাণী রঘুপতির নাস্তিকতার দৃঢ়তা দেখিয়া প্রত্যয় করিলেন যে 'দেবী নাই'। এতদিন রঘুপতির কথাতেই তিনি স্বামীর বিরোধী হইয়া দেবীর উপর নির্ভর করিতেছিলেন, এখন সেই রঘুপতি

যখন তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে দেবী নাই, তখন তিনি মিথ্যার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিলেন। রাণী ও রাজার মধ্যে যে পাষাণী-প্রতিমা প্রাচীর হইয়া উঠিয়া ব্যবধান রচনা করিয়াছিল, উহা অপসৃত হইবামাত্র রাণী রাজার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অপর্ণা মূর্ছা হইতে উঠিয়া রঘুপতিকে 'পিতা' বলিয়া আহ্বান করিল। অপর্ণা নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিল যে, আজ রঘুপতি কী দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়াছেন! সেইজন্য রঘুপতির প্রতি আজ তাহার রমণীহৃদয়ের অনুকম্পার আর অবধি নাই। রঘুপতি অপর্ণার কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন শুনিয়া পুনরায় স্নেহের আস্বাদ পাইলেন এবং মনে করিলেন জয়সিংহই অপর্ণার কণ্ঠে এই স্নেহসম্বোধন রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জয়সিংহকে রঘুপতি ও অপর্ণা উভয়েই ভালবাসিতেন এবং জয়সিংহও রঘুপতিকে ও অপর্ণাকে ভালবাসিতেন। এইজন্য রঘুপতি ও অপর্ণা উভয়ে উভয়ের সমব্যথী হইতে পারিলেন এক জয়সিংহের প্রতি প্রেমের সূত্রে। অপর্ণা রঘুপতিকে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আহ্বান করিল।

রাজা ফুল লইয়া দেবীকে শেষ পূজা দিতে আসিলেন এবং দেবীপ্রতিমার তিরোধান ও মন্দিরে রক্তধারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রঘুপতি রাজাকে বলিলেন—

এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে!

যে মন্দিরে নিরীহ পশুহিংসা হইয়াছে, যেখানে ধর্মের নামে কত অধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে কত পাপের ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সেই মন্দির আজ এতদিন পরে রঘুপতির কাছে পাপপূর্ণ কণ্টকময় বলিয়া বোধ হইয়াছে। আর জয়সিংহ পশুহিংসা রাজহত্যা গুপ্তহত্যা প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যে আত্মদান করিলেন, সেই রক্ত পুণ্যময় মনে হইতেছে। জয়সিংহের দেবতুল্য চরিত্রের এই পুণ্যাবদানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া রাজা দেবীপূজার জন্য আনীত ফুল দেবতুল্য জয়সিংহকেই দান করিলেন—

ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

রাণী গুণবতী আসিয়া এইবার রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা!

গুণবতী এতদিনের কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া এখন প্রেমের আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজা বলিলেন—

গেছে পাপ! দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

পাপ কুসংস্কার হিংসা দ্বেষ মুছিয়া গেল। প্রকৃত যিনি দেবী তিনি তো প্রেমময়ী, তিনিই আজ মহারাণীর গভীর প্রেমের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

রঘুপতিও অনুভব করিলেন—

পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার
এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী?

নিষ্ঠুরতার দ্বারা দেবতার পূজা হয় না, দেবতা দয়াময়ী প্রেমময়ী; প্রেমে ও দয়াতেই তাঁহার সত্য আবির্ভাব—এই কথা আজ রঘুপতি উপলব্ধি করিয়াছেন। রঘুপতি আজ বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃত ও পূর্ণ মনুষ্যত্বই দেবত্ব। তিনি এতদিন হিংসার মধ্যে দেবীর মিথ্যা সন্ধান করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছিলেন; আজ প্রেমের মধ্যে প্রকৃত দেবীর সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইলেন।

অপর্ণা পুনরায় রঘুপতিকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিল—'পিতা চ'লে এসো!' সে রঘুপতিকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিল চলিয়া আসিতে—মিথ্যা হইতে, হিংসা হইতে, সংস্কার হইতে, প্রেমের ও সত্যের সুবৃহৎ ক্ষেত্রে।

এইখানে বিসর্জন সম্পূর্ণ হইল—মিথ্যা দেবীপ্রতিমার বিসর্জন হইল, জয়সিংহের ন্যায় মহাপ্রাণের বিসর্জন হইল, রঘুপতির ন্যায় বলিষ্ঠ উন্নত হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসার বিসর্জন হইল, রাণীর ভ্রমের বিসর্জন হইল, রাজা ও রাণীর মধ্যেকার বিদ্রোহের বিসর্জন হইল।

বৌঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায়ের চরিত্রে কবি যে অহিংসা ও বৈষ্ণব ভাব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহাই যেন স্পষ্টতর হইয়া বিসর্জন নাটকে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'মানসী'-যুগের কবিতা ও নাট্যগুলির মধ্যে……সংশয়-বিষাদের ছায়াময় সঞ্চরণ। সমস্ত লেখার মধ্যেই একটা বেদনার সুর মাখা…নাট্যগুলির মধ্যেও একটি গভীর করুণ সুর ধরা পড়ে।

—রবীন্দ্রজীবনী।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের তাৎপর্য নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন*—

"বিসর্জন—এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন ক'রে হয়েছে? আমরা দেখ্‌তে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা-বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘট্‌ল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার ক'রে দিয়েছিল।

সুতরাং প্রতিমা-বিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ, তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝ্‌তে পারল যে সে যা হারাল তা কত মূল্যবান্। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিস সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল, কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝ্‌তে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তারপর অনুভব করতে পারল যে প্রাণের মূল্য কত বেশী, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল—তার চৈতন্য হলো, বোধ্‌বার বাধা দূর হলো, প্রেম জয়যুক্ত হলো।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রাণী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয়নি ব'লে সন্তান লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বল্‌লেন—আমাকে দয়া ক'রে সন্তান দাও। আমার সব আছে—দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিন্তু আমার শুপ্ত বক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আরেকটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী হবে। এই বক্ষ বাহু—তা কতখানি ভালোবাসা পেতে চায়। শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে আমি তার প্রতি আমার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ করব।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশী! একদিকে রাণী মানত করছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ, অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং রাণীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জান্‌ছেন যে ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হ'তে পারে যে তার জন্য লোকে

* সমালোচনাটি পরবর্তী পরিবর্তিত বিসর্জন নাটককে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তারপর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বল্‌লে—তুমি যদি একদিক্ দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হ'য়ে প্রাণকে পালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণহত্যায় খুশী হন?—যদি তিনি তা বোঝেন, তবে কেমন ক'রে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ?—মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কি ক'রে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা ব'লে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজি আছেন,—অথচ চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্যদল তা বোঝেনি,—তাই দুই দলে বিরোধ বাধ্‌ল। গুণবতী ও রঘুপতি একদিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্যদিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মতো ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। তাই যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনের প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হ'তে সুরু হলো। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে—যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায়নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হলো—রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা। এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় ক'রে দিয়েছিল, অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে কত বড় অন্যায়কে সে সমর্থন ক'রে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল ক'রে দিলে। যে জীবকে অপর্ণা কোলে ক'রে পালন করেছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়ছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠ্‌ল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বল্‌ল—'এ কি তোমার মায়া? এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আর তুমি বিশ্বজননী হ'য়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই?' জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক্ হ'তে আকর্ষণ করতে লাগল। একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ করতে বল্‌ছে, অপরদিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধ'রে রাখ্‌তে চায়।

রঘুপতির দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন ক'রে এসেছে এবং এমনি ভাবে শক্তিলাভ ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে। সে দেবীর সেবক ব'লে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার পক্ষে আন্‌তে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধ্‌তে চায়।

কিন্তু অপর্ণা আরেক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বল্‌লে—'এই নির্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরো না, তুমি মন্দির ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এস।'—জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। একদল লোক বাহুশক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন ক'রে রাখ্‌তে চায়—অন্যদল বল্‌ছে প্রেমই সব চেয়ে বড় জিনিস। জয়সিংহ সেই দোটানার মাঝখানে পড়্‌ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা ক'রে বা'র কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

রঘুপতি পণ্ডিত বৃদ্ধ সম্মানিত ও শক্তিশালী। আর অপর্ণা বালিকা ভিখারিণী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ কর্‌ছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল ব'লে মনে হয়, কিন্তু কার্যত তারই জয় হ'ল। অথচ রঘুপতি শক্তিশালী—তার দিকে শাস্ত্রমত দেশাচার লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্য-সামন্ত অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই—কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হ'তে থাকে।

—শান্তিনিকেতন, ১৩২৯ কার্ত্তিক।

বিসর্জন নাটকের প্রথম সংস্করণে—অপর্ণার অন্ধ পিতা, হাসি ও তাতা (ধ্রুব), কেদারেশ্বর (হাসি ও তাহার খুল্লতাত) এই কয়টি চরিত্র ছিল। হাসি ও তাতা ঐ সংস্করণে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের আনন্দের উৎস। তাহারা—

প্রতিদিন প্রাতে আসে—যেন তারা মোর
সুপ্তচিত্ত-বাতায়নে দুটি কিরণের
রেখা,—প্রভাতের প্রথম সংবাদ নিয়ে
আসে, বৈকুণ্ঠের দুটি শুভ্র দূতশিশু!

উহাদের অদর্শনে রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। বিসর্জন নাটকের পরবর্তী সংস্করণে—অপর্ণার অন্ধ পিতা, হাসি ও কেদারেশ্বরের চরিত্র বর্জিত হইয়াছে। ধ্রুব চরিত্রটি রাজার পালিত বালক রূপে নাটকে রক্ষিত হইয়াছে।

Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka.